মিসমিদের কবচ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ....................3
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ....................6
তৃতীয় পরিচ্ছেদ....................9
চতুর্থ পরিচ্ছেদ....................13
পঞ্চম পরিচ্ছেদ....................20
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ....................22
সপ্তম পরিচ্ছেদ....................26
অষ্টম পরিচ্ছেদ....................29
নবম পরিচ্ছেদ....................36
দশম পরিচ্ছেদ....................38
একাদশ পরিচ্ছেদ....................42
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ....................46
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ....................49
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ....................51
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ....................55

www.bengaliebook.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুর গ্রামে সেদিন নন্দোৎসব।

শ্যামপুরের পাশের গ্রামে আমার মাতুলালয়। চৌধুরী-বাড়ির উৎসবে আমার মামার বাড়ির সকলের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ ছিলসুতরাং সেখানে গেলাম।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একটা শতরঞ্জি পেতে বৈঠকখানায় বসে আসর জমিয়েচেন। আমার বড়ো মামা বিদেশে থাকেন, সম্প্রতি ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেনসবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলে।

এই যে আশুবাবু, সব ভালো তো? নমস্কার!

নমস্কার। একরকম চলে যাচ্ছেআপনাদের সব ভালো?

ভালো আর কই? জ্বরজাড়ি সব। ম্যালেরিয়ার সময় এখন, বুঝতেই পারছেন।

আপানার সঙ্গে এটি কে?

আমার ভাগনে, সুশীল। আজই এসেচেনিয়ে এলাম তাই।

বেশ করেচেন, বেশ করেছেন, আনবেনই তো। কী করেন বাবাজি?

এখানে আমি মামাকে চোখ টেপবার সুবিধে না পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি টিপে দিলাম।

মামা বললেনঅফিসে চাকরি করে কলকাতায়।

বেশ, বেশ। এসো বাবাজি, বোসো এসে এদিকে।

মামার আঙুল টিপবার কারণটা বলি। আমি কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেকটিভ নিবারণ সোমের অধীনে শিক্ষানবিশি করি। কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

নন্দোৎসব এবং আনুষঙ্গিক ভোজনপর্ব শেষ হল। আমরা বিদায় নেবার জোগাড় করচি, এমন সময় গ্রামের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার মামাকে ডেকে বললেন–কাল আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে আছে, সুবিধে হবে কী?

বিলক্ষণ! খুব সুবিধে হবে! আসুন না গাঙ্গুলিমশায়, আমার ওখানেই তাহলে দুপুরে আহারাদি করবেন কিন্তু।

না না, তা আবার কেন? আপনার পুকুরে মাছ ধরতে দিচ্ছেন এই কত, আবার খেয়ে বিব্রত করতে যাব কেন?

তাহলে মাছ ধরাও হবে না বলে দিচ্চি। মাছ ধরতে যাবেন কেবল এই এক শর্তে।

গাঙ্গুলিমশায় হেসে রাজি হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে হরিশ গাঙ্গুলিমশায় মামার বাড়িতে এলেন। পল্লিগ্রামের পাকা ঘুঘু মাছ-ধরায়, সঙ্গে ছ-গাছা ছোটো-বড়ো ছিপ, দু-খানা হুইল লাগানোবাকি সব বিনা হুইলের, টিনে ময়দার চার, কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম, আরও কত কী।

মামাকে হেসে বললেন–এলাম বড়োবাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে। একটা লোক দিয়ে গোটাকতক কঞ্চি কাটিয়ে যদি দেন–কেঁচোর চার লাগাতে হবে।

মামা জিজ্ঞেস করলেন–এখন বসবেন, না, ওবেলা?

না, এবেলা বসা হবে না। মাছ চারে লাগাতে দু-ঘণ্টা দেরি হবে। ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। একটু সকাল-সকাল যদি আহারের ব্যবস্থা ...

হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। আমিও জানি, আপনি এসেই খেতে বসবার জন্যে তাগাদা দেবেন। মাছ যারা ধরে, তাদের কাছে খাওয়া-টাওয়া কিছুই নয় খুব জানি। আর ঘণ্টা খানেক পরেই জায়গা করে দেব খাওয়ার।

যথাসময়ে হরিশ গাঙ্গুলি খেতে বসলেন এবং একা প্রায় তিনজনের উপযুক্ত খাদ্য উদরসাৎ করলেন।

আমি কলকাতার ছেলে, দেখে তো অবাক।

আমার মামা জিজ্ঞেস করলেনগাঙ্গুলিমশায়, আর একটু পায়েস?

তা একটুখানি না হয়... ওসব তো খেতে পাইনে! একা হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাই। বাড়িতে মেয়েমানুষ নেই, বউমারা থাকেন বিদেশে আমার ছেলের কাছে। কে ওসব করে দেবে?

গাঙ্গুলিমশায় কি একাই থাকেন? একাই থাকি বই কী। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, আমার শহরে থাকা পোষায় না। তা ছাড়া কিছু নগদ লেন-দেনের কারবারও করি, প্রায় তিনহাজার টাকার ওপর। টাকায় দু আনা মাসে সুদ। আপনার কাছে আর লুকিয়ে কী করব? কাজেই বাড়ি না থাকলে চলে কই? লোকে প্রায়ই আসচে টাকা দিতে-নিতে।

গাঙ্গুলিমশায় এই কথাগুলি যেন বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বললেন।

আমি পল্লিগ্রাম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ না হলেও আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলে। টাকাকড়ির কথা এ ভাবে লোকজনের কাছে বলে লাভ কী! বলা নিরাপদও নয়শোভনতা ও রুচির কথা যদি বাদই দিই।

গাঙ্গুলিমশায়কে আমার বেশ লাগল।

মাছ ধরতে ধরতে আমার সঙ্গে তিনি অনেক গল্প করলেন।

... থাকেন তিনি খুব সামান্য ভাবে–কোনো আড়ম্বর নেই–খাওয়া-দাওয়া বিষয়েই কোনো ঝট নেই তাঁর। ...এই ধরনের অনেক কথাই হল।

মাছ তিনি ধরলেন বড়ো বড়ো দুটো। ছোটো গোটা-চার-পাঁচ। আমার মামাকে অর্ধেকগুলি দিতে চাইলেন, মামা নিতে চাইলেন না। বললেন–কেন গাঙ্গুলিমশায়? পুকুরে মাছ ধরতে এসেছেন, তার খাজনা নাকি?

গাঙ্গুলিমশায় জিব কেটে বললেনআরে রামো! তাই বলে কী বলচি? রাখুন অন্তত গোটা দুই!

না গাঙ্গুলিমশায়, মাপ করবেন, তা নিতে পারব না। ও নেওয়ার নিয়ম নেইআমাদের।

.

অগত্যা গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলেন। আমায় বলে গেলেনতুমি বাবাজি একদিন আমার ওখানে যেও একটা ছুটিতে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড়ো আনন্দ হল আজ।

কে জানত যে তাঁর বাড়িতে আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই যেতে হবে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণেঅন্য উদ্দেশ্যে।

গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে খোশগল্প করার জন্যে নয়।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলে আমি মামাকে বললাম–আপনি মাছ নিলেন না কেন? উনি দুঃখিত হলেন নিশ্চয়।

মামা হেসে বললেন–তুমি জান না, নিলেই দুঃখিত হতেন–উনি বড়ো কৃপণ।

তা কথার ভাবে বুঝেচি।

কী করে বুঝলে?

অন্য কিছু নয় বউ-ছেলেরা কলকাতায় থাকে, উনি থাকেন দেশের বাড়িতে। একটা চাকর কী রাঁধুনি রাখেন না, হাত পুড়িয়ে এ-বয়সে বেঁধে খেতে হয় তাও স্বীকার। অথচ হাতে দু পয়সা বেশ আছে।

আর কিছু লক্ষ করলে?

বড়ো গল্প বলা স্বভাব! আমার ধারণা, একটু বাড়িয়েও বলেন।

ঠিক ধরেচ। মাছ নিইনি তার আর-একটি কারণ, উনি মাছ দিয়ে গেলে সব জায়গায় সে গল্প করে বেড়াবেন, আর লোকে ভাববে আমরা কি চামারপুকুরে মাছ ধরেছে বলে ওঁর কাছ থেকে মাছ নিইচি।

না মামা, এটি আপনার ভুল। একথা ভাববার কারণ কী লোকদের? তা কখনো কেউ ভাবে?

তা যাই হোক, মোটের উপর আমি ওঠা পছন্দ করি নে।

উনি একটা বড়ো ভুল করেন মামাবাবু। টাকার কথা অমন বলে বেড়ান কেন?

ওটা ওঁর স্বভাব। সর্বত্র ওই করবেন। যেখানে বসবেন, সেখানেই টাকার গল্প। করেও আজ আসছেন বহুদিন। দেখাতে চান, হাতে দু-পয়সা আছে।

আমার মনে হয় ও-স্বভাবটা ভালো নয়বিশেষ করে এইসব পাড়াগাঁয়ে। একদিন আপনি একটু সাবধান করে দেবেন না?

সে হবে না। তুমি ওঁকে জান না। বড্ড একগুঁয়ে। কথা তো শুনবেনই নাআরও ভাববেন, নিশ্চয়ই আমার কোনো মতলব আছে।

আমি সেদিন কলকাতায় চলে এলাম বিকেলের ট্রেনে। আমার ওপরওয়ালা নিবারণবাবু লিখেছেন, খুব শিগগির আমায় একবার এলাহাবাদে যেতে হবে বিশেষ একটা জরুরি কাজে। অফিসে যেতেই খবর পেলাম, তিনি আর-একটা কাজে দু-দিনের জন্য পাটনা গিয়েচেন চলেআমার এলাহাবাদ যাবার খরচের টাকা ও একখানা চিঠি রেখে গিয়েছেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে।

আমার কাছে তাঁর ড্রয়ারের চাবি থাকে। ড্রয়ার খুলে চিঠিখানা পড়ে দেখলাম, বিশেষ কোনো গুরুতর কাজ নয়এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট থাম্ব-ইমপ্রেশন-বুরোতে যেতে হবে, কয়েকটি দাগি বদমাইশের বুড়ো-আঙুলের ছাপের একটা ফোটো নিতে।

মি. সোম বুড়ো-আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এলাহাবাদের কাজ শেষ করতে আমার লাগল মাত্র একদিন, আট-দশদিন রয়ে গেলাম তবুও।

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ মি. সোমের এক টেলিগ্রাম পেলাম। একটা জরুরি কাজের জন্য আমায় সেইদিনই কলকাতায় ফিরতে লিখেছেন। আমি যেন এলাহাবাদে দেরি না করি।

.

ভোরে হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি, মি. সোম প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, কারণ, এরকম কখনো উনি আসেন না।

আমার বললেনসুশীল, তুমি আজই মামার বাড়ি যাও। তোমার মামা কাল দু-খানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করেছেন তোমায় সেখানে যাবার জন্যে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম–মামার বাড়ি কারো অসুখ। সবাই ভালো আছে তো?

সেসব নয় বলেই মনে হল। টেলিগ্রামের মধ্যে কারো অসুখের উল্লেখ নেই।

কোনো লোক আসেনি সেখান থেকে?

না। আমি তার করে দিয়েছি, তুমি এলাহাবাদে গিয়েচ। আজই তোমার ফিরবার তারিখ তাও জানিয়ে দিয়েছি।

আমি বাসায় না গিয়ে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে চলে এলাম মামার বাড়ি যাবার জন্যে।

মি. সোম আমার সঙ্গে এলেন শেয়ালদা পর্যন্তবার বার করে বলে দিলেন, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাঁকে যেন খবর দিইতিনি খুব উদবিগ্ন হয়ে রইলেন।

মামার বাড়ি পা দিতেই বড়ো মামা বললেন–এসেছিস সুশীল? যাক, বড্ড ভাবছিলাম?

কী ব্যাপার মামাবাবু? সবাই ভালো তো?

এখানকার কিছু ব্যাপার নয়। শ্যামপুরের হরিশ গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছেন। সেখানে এখুনি যেতে হবে।

আমি ভীত ও বিস্মিত হয়ে বললাম–গাঙ্গুলিমশায়। সেদিন যিনি মাছ ধরে গেলেন! খুন হয়েচেন?

হ্যাঁ, চলো একেবার সেখানে। শিগগির স্নানাহার করে নাও। কারণ, সারাদিনই হয়তো কাটবে সেখানে।

বেলা দুটোর সময় শ্যামপুরে এসে পৌঁছোলাম। ছোট্ট গ্রাম। কখনো সেখানে কারো একটা ঘটি চুরি হয়নি–সেখানে খুন হয়ে গিয়েছে, সুতরাং গ্রামের লোকে দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেছে। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারি-পূজা-মন্ডপে জড়ো হয়ে সেই কথারই আলোচনা করছে সবাই।

আমার মামা এখানে এর পূর্বে অনেকবার এসেছিলেন এই ঘটনা উপলক্ষ্যে, তা সকলের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল। আমার কথা বিশেষ কেউ জিগ্যেস করলে না বা আমার সম্বন্ধে কেউ কোনো আগ্রহও দেখালে না। কেউ জানে না, আমি প্রাইভেট-ডিটেকটিভ মি. সোমের শিক্ষানবিশ ছাত্রএসব অজ পাড়াগাঁয়ে ওঁর নামই কেউ শোনেনিআমাকে সেখানে কে চিনবে?

মামা জিগ্যেস করলেন–লাশ নিয়ে গিয়েছে?

ওরা বললেআজ সকালে নিয়ে গেল। পুলিশ এসেছিল।

আমি ওদের বললামব্যাপার কীভাবে ঘটল? আজ হল শনিবার। কবে তিনি খুন হয়েছেন।

গ্রামের লোকে যেরকম বললে তাতে মনে হল, সে-কথা কেউ জানে না। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল। পুলিসের কাছেও এরা এইরকমই বলে ব্যাপারটাকে রীতিমতো গোলমেলে করে তুলেছে।

আমি আড়ালে মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম–আপনি কী মনে করে এখানে এনেচেন আমায়?

মামা বললেন–তুমি সব ব্যাপার শুনে নাও, চলো, অনেক কথা আছে। এই খুনের রহস্য তোমায় আবিষ্কার করতে হবেতবে বুঝব মি. সোমের কাছে তোমায় শিক্ষানবিশ করতে দিয়ে আমি ভুল করিনি। এখানে কেউ জানে না তুমি কী কাজ করোসে তোমার একটা সুবিধে।

সুবিধেও বটে, আবার অসুবিধেও বটে।

কেন?

বাইরের বাজে লোককে কেউ আগ্রহ করে কিছু বলবে না। গোলমাল একটু থামলে একজন ভালো লোককে বেছে নিয়ে সব ঘটনা খুঁটিয়ে জানতে হবে। গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে কোথায়?

সে লাশের সঙ্গে মহকুমায় গিয়েছে। সেখানে লাশ কাটাকুটি করবে ডাক্তারে, তারপর দাহকার্য করে ফিরবে।

লাশ দেখলে বড় সুবিধে হত। সেটা আর হল না

সেইজন্যেই তো বলছি, তুমি কেমন কাজ শিখেচ, এটা তোমার পরীক্ষা। এতে যদি পাস করো তবে বুঝব তুমি মি. সোমের উপযুক্ত ছাত্র। নয়তো তোমাকে আমি আর ওখানে রাখব না–এ আমার এক-কথা জেনো।

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি গেলাম।

গিয়ে দেখি, যেখানটাতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি–তার দু-দিকে ঘন-জঙ্গল। একদিকে দূরে একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একদিকে একটি হচ্ছে বাড়ি।

আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের কথা জিগ্যেস করে জানলাম, সে এখনও মহকুমা থেকে ফেরেনি। তবে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হল–শুনলাম তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মীয়া।

তাঁকে জিগ্যেস করলামগাঙ্গুলিমশায়কে শেষ দেখেছিলেন কবে?

বুধবার।

কখন?

বিকেল পাঁচটার সময়।

কীভাবে দেখেছিলেন?

সেদিন হাটবার ছিল–উনি হাটে যাবার আগে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিলেন।

কীসের পয়সা?

সুদের পয়সা। আমি ওঁর কাছে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলাম ও-মাসে।

আপনার পর আর কেউ দেখেছিল?

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির ঠিক পশ্চিমগায়ে যে বাড়ি, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রৌঢ়া বললেন–ওই বাড়ির রায়-পিসি আমার পরও তাঁকে দেখেছিলেন?

আমি বৃদ্ধা রায়-পিসির বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা আমায় আশীর্বাদ করে একখানা পিঁড়ি বার করে দিয়ে বললেন–বোসো বাবা।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম–আপনি একা থাকেন নাকি এ বাড়িতে।

হ্যাঁ বাবা। আমার তো কেউ নেই–মেয়ে-জামাই আছে, তারা দেখাশুনো করে।

মেয়ে-জামাই এখানে থাকেন?

এখানেও থাকে, আবার তাদের দেশ এই এখান থেকে চার ক্রোশ দূর সাধুহাটি গাঁয়ে, সেখানেও থাকে।–

গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি বুধবারে কখন দেখেন?

রাত্তিরে যখন উনি হাট থেকে ফিরলেন–তখন আমি বাইরের রোয়াকে বসে জপ করছিলাম। তারপর আর চোখে না দেখলেও ওঁর গলার আওয়াজ শুনেচি রাত দশটা পর্যন্তউনি ওঁর রান্নাঘরে রাঁধছিলেন আলো জ্বেলে, আমি যখন শুতে যাইতখনপর্যন্ত।

তখন রাত কত হবে?

তা কী বাবা জানি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক–ঘড়ি তো নেই বাড়িতে। তবে তখন ফরিদপুরের গাড়ি চলে গিয়েছে। আমরা শব্দ শুনে বুঝি কখন কোন গাড়ি এল-গেল।

একা থাকতেন, আর রাত পর্যন্ত রান্না করছিলেন–এত কী রান্না?

সেদিন মাংস এনেছিলেন হাট থেকে। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হচ্ছিল।

আপনি কী করে জানলেন?

পরে আমরা জেনেছিলাম। হাটে যারা ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে মাংস কিনেছিল–তারা বলেছিল। তা ছাড়া যখন রান্নাঘর খোলা হলবাবাগো!

বলে বৃদ্ধা যেন সে দৃশ্যের বীভৎসতা মনের পটে আবার দেখতে পেয়ে শিউরে উঠে কথা বন্ধ করলেন। সঙ্গে যে প্রৌঢ়া আত্মীয়টি ছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের, তিনিও বললেনও বাবা, সে রান্নাঘরের কথা মনে হলে এখনও গা ডোল দেয়!

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলামকেন? কেন?কী ছিল রান্নাঘরে?

বৃদ্ধা বললেন–থালার চারদিকে ভাত ছড়ানোমাংসের ছিবড়ে আর হাড়গোড় ছড়ানো।

বাটিতে তখনও মাংস আর ঝোল রয়েছে–ঘরের মেঝেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন–তিনি খেতে বসেছিলেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ হবার আগেই যারা তাঁকে খুন করে তারা এসে পড়ে।

প্রৌঢ়াও বললেন–হ্যাঁ বাবা, এ সবাই দেখেচে। পুলিশও এসে রান্নাঘর দেখে গিয়েছে। সকলেরই মনে হল, ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হবার আগেই খুনেরা এসে তার ওপরপড়ে।

আচ্ছা বেশ, এ গেল বুধবার রাতের ব্যাপার। সেদিনই হাট ছিল তো?

হ্যাঁ বাবা, তার পরদিন সকালে উঠে আমরা দেখলাম, ওঁর ঘরের দরজা বাইরের দিকে তালা-চাবি দেওয়া। প্রথম সকলেই ভাবলে উনি কোথাও কাজে গিয়েচেন, ফিরে এসে রান্নাবান্না করবেন। কিন্তু যখন বিকেল হয়ে গেল, ফিরলেন না–তখনআমরা ভাবলাম, উনি ওঁর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গেছেন।

তারপর?

বিষ্যুদবার গেল, শুক্রবার গেল, শুক্রবার বিকেলের দিকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে থেকে কীসের দুর্গন্ধ বেরোতে লাগলতাও সবাই ভাবলে, ভাদ্রমাস, গাঙ্গুলিমশায় হয়তো তাল কুড়িয়ে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন তাই পচে অমন গন্ধ বেরোচ্ছে।

শনিবার আপনারা কোন সময় টের পেলেন যে, তিনি খুন হয়েছেন?

শনিবারে আমি গিয়ে গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে সব বললাম। অনেকেই জানত না যে, গাঙ্গুলিমশায়কে এ ক-দিন গাঁয়ে দেখা যায়নি। তখন সকলেই এল। গন্ধ তখনখুব বেড়েছে! পচা তালের গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না!

কী করলেন আপনারা?

তখন সকলে জানলা খোলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। দোর ভাঙাই সাব্যস্ত হল। পরের ঘরের দোর ভেঙে ঢোকা ঠিক নয়–এরপর যদি তা নিয়ে কোনো কথা ওঠে। তখন চৌকিদার আর দফাদার ডেকে এনে তাদের সামনে দোর ভাঙা হল।

কী দেখা গেল?

দেখা গেল, তিনি ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন! মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে মারার দাগ। মেজে খুঁড়ে রাশীকৃত মাটি বার করা, ঘরের বাক্স-প্যাঁটরা সব ভাঙা, ডালা খোলা–সব তচনচ করেচে জিনিসপত্র। ... তারপর ওঁর ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হল।

এ ছাড়া আর কিছু আপনারা জানেন না?

না বাবা, আর আমরা কিছু জানি নে।

গাঙ্গুলিমশায়ের প্রতিবেশিনী সেই বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলামরাত্রে কোনোরকম শব্দ শুনেছিলেন? গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি থেকে?

কিছু না। অনেক রাত্তিরে আমি যখন শুতে যাই–তখনও ওঁর রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। আমি ভাবলাম, গাঙ্গুলিমশায় আজ এখনও দেখি রান্না করছেন!

কেন, এ-রকম ভাবলেন কেন?

এত রাত পর্যন্ত তো উনি রান্নাঘরে থাকেন না; সকাল রাত্তিরেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। বিশেষ করে সেদিন গিয়েছে ঘোর অন্ধকার রাত্তির–অমাবস্যা, তার ওপর টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

তখন তো আর আপনি জানতেন না যে, উনি হাট থেকে মাংস কিনে এনেছেন?

না, এমন কিছুই জানি নে। ... হ্যাঁ বাবা, ... যখন এত করে জিগ্যেস করচ, তখন একটা কথা আমার এখন মনে হচ্ছে–

কী, কী, বলুন?

উনি ভাত খাওয়ার পরে রোজ রাত্তিরে কুকুর ডেকে এঁটো পাতা, কী পাতের ভাত তাদের দিতেন, রোজ রোজ ওঁর গলার ডাক শোনা যেত। সেদিন আমি আর তা শুনিনি।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো।

না বাবা, বুড়ো-মানুষ ঘুম সহজে আসে না। চুপ করে শুয়ে থাকি বিছানায়। সেদিন আর ওঁর কুকুরকে ডাক দেওয়ার আওয়াজ আমার কানেই যায়নি।

ভালো করে জেরা করার ফল অনেক সময় বড়ো চমৎকার হয়। মি. সোম প্রায়ই বলেন –লোককে বারবার করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। যা হয়তো তার মনে নেই, বা, খুঁটিনাটির ওপর সে তত জোর দেয়নি তোমার জেরায় তা তারও মনে পড়বে। সত্য বার হয়ে আসে অনেক সময় ভালো জেরার গুণে।

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনই আমার সঙ্গে গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের দেখা হল। সে তার পিতার দাহকার্য শেষ করে ফিরে আসছে কাছাগলায়।

আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম। শ্রীগোপালের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। সে আমাকে সবরকমের সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিলে।

আমি বললাম, কারো ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

কার কথা বলব বলুন। বাবার একটা দোষ ছিল, টাকার কথা জাহির করে বেড়াতেন সবার কাছে। কত জায়গায় এসব কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কে এ-কাজ করলে কী করে বলি?

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব–কিছু মনে করবেন না। আপনার বাবার কত টাকা ছিল জানেন?

বাবা কখনো আমাদের বলতেন না। তবে, আন্দাজ, দু-হাজারের বেশি নগদ টাকা ছিল না।

সে টাকা কোথায় থাকত?

সেটা জানতাম। ঘরের মেঝেতে বাবা পুঁতে রাখতেন–কতবার বলেছি, টাকা ব্যাংকে রাখুন। সেকেলে লোক, ব্যাংক বুঝতেন না।

গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর পর বাড়ি এসে আপনি মেজে খুঁড়ে কিছু পেয়েছিলেন?

মেঝে তো খুঁড়ে রেখেছিল যারা খুন করেছে তারাই। আমি এক পয়সাও পাইনি–তবে একটা কথা বলি–দু-হাজার টাকার সব টাকাই তো মেঝেতে পোঁতা ছিল না–বাবা টাকা ধার দিতেন কিনা! কিছু টাকা লোকজনকে ধার দেওয়া ছিল।

কত টাকা আন্দাজ?

সেদিক থেকেও মজা শুনুন, বাবার খাতাপত্র সব ওই সঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েছে। খাতা না দেখলে বলা যাবে না কত টাকা ধার দেওয়া ছিল।

খাতাপত্র নিজেই লিখতেন?

তার মধ্যে গোলমাল আছে। আগে নিজেই লিখতেন, ইদানীং চোখে দেখতে পেতেন না বলে এক-ওকে ধরে লিখিয়ে নিতেন।

কাকে-কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন জানেন?

বেশিরভাগ লেখাতেন সদগোপ-বাড়ির ননী ঘোষকে দিয়ে। সে জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করে–তার হাতের লেখাও ভালো। বাবার কথা সে খুব শুনত।

ননী ঘোষের বয়েস কত?

ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

ননী ঘোষ লোক কেমন? তার ওপর সন্দেহ হয়।

মুশকিল হয়েছে, বাবা তো একজনকে দিয়ে লেখাতেন না! যখন যাকে পেতেন, তখন তাকেই ধরে লিখিয়ে নিতেন যে! স্কুলের ছেলে গণেশ বলে আছে, ওই মুখুজ্যে বাড়ি থেকে পড়ে–তাকেও দেখি একদিন ডেকে এনেছেন। শুধু ননী ঘোষের ওপর সন্দেহ করে কী করব?

আর কাকে দেখেছেন?

আর মনে হচ্ছে না।

আপনি হিসেবের খাতা দেখে বলে দিতে পারেন, কোন হাতের লেখা কার?

ননীর হাতের লেখা আমি চিনি। তার হাতের লেখা বলতে পারি–কিন্তু সে খাতাই বা কোথায়? খুনেরা সে খাতা তো নিয়ে গিয়েছে!

কাকে বেশি টাকা ধার দেওয়া ছিল, জানেন?

কাউকে বেশি টাকা দিতেন না বাবা। দশ, পাঁচ, কুড়ি–বড়োজোর ত্রিশের বেশি টাকা একজনকেও তিনি দিতেন না।

.

শ্যামপুরের জমিদারবাড়ি সেবেলা খাওয়া-দাওয়া করলাম।

একটি বড়ো চত্বর, তার চারিধারে নারিকেল গাছের সারি, জামরুল গাছ, বোম্বাই-আমের গাছ, আতা গাছ। বেশ ছায়াভরা উপবন যেন, ডিটেকটিভগিরি করে হয়তো ভবিষ্যতে খাব–তা বলে প্রকৃতির শোভা যখন মন হরণ করে–এমন মেঘমেদুর বর্ষা-দিনে গাছপালার শ্যামশোভা উপভোগ করতে ছাড়ি কেন?

বসলুম এসে চত্বরের একপাশে নির্জন গাছের তলায়।

বসে বসে ভাবতে লাগলুম।

… কী করা যায় এখন? মামা বড়ো কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে এনে ফেলেছেন?

মি. সোমের উপযুক্ত ছাত্র কিনা আমি, এবার তা প্রমাণ করার দিন এসেছে।

কিন্তু বসে বসে মি. সোমের কাছে যতগুলি প্রণালী শিখেচি খুনের কিনারা করবার– সবগুলি পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী–স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভের প্রণালী। এখানে তার কোনোটিই খাটবে না। আঙুলের ছাপ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয়নি– সাত-আটদিন পরে এখন জিনিসপত্রের গায়ে খুনির আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পায়ের দাগ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

খুন হবার পর এত লোক গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে ঢুকেচে–তাদের সকলের পায়ের দাগের সঙ্গে খুনির পায়ের দাগ একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের কৌতূহলী লোকেরা আমায় কী বিপদেই ফেলেচে! তারা জানে না, একজন শিক্ষানবিশ-ডিটেকটিভের কী সর্বনাশ তারা করেচে!

আর একটা ব্যাপার, খুনটা টাটকা নয়, সাতদিন আগে খুন হয়ে লাশ পর্যন্ত দাহ শেষ সব ফিনিশ– গোলমাল চুকে গিয়েছে।

চোখে দেখিনি পর্যন্ত সেটা–অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন-টিহ্নগুলি দেখলেও তো যা হয় একটি ধারণা করা যেত। এ একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া! ভীষণ সমস্যা।

মি. সোমকে কী একখানা চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাব? এমনঅবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কী করতেন জানাতে বলব?

কিন্তু তাও তো উচিত নয়।

মামা যখন বলেছেন, এটা যদি আমার পরীক্ষা হয়, তবে পরীক্ষার হলে যেমন ছেলেরা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে নেয় না–আমায় তাই করতে হবে।

যদি এর কিনারা করতে পারি, তবে মামা বলেছেন, আমাকে এ-লাইনে রাখবেন–নয়ত মি. সোমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন, নিয়ে হয়তো কোনো আর্টিস্টের কাছে রেখে

ছবি আঁকতে শেখাবেন বা বড়ো দরজির কাছে রেখে শার্ট তৈরি, পাঞ্জাবি তৈরি শেখাবেন।

তবে শিক্ষানবিশের প্রথম পরীক্ষা-হিসেবে পরীক্ষা যে বেশ কঠিন, এতে কোনো ভুল নেই।...

বসে-বসে আরও অনেক কথা ভাবলুম।

...হিসেবের খাতা যে লিখত, সে নিশ্চয়ই জানত ঘরে কত টাকা মজুত, বাইরে কত টাকা ছড়ানো। তার পক্ষে জিনিসটা জানা যত সহজ, অপরের পক্ষে তত সহজনয়।

এ-বিষয়েও একটা গোলমাল আছে। গাঙ্গুলিমশায় টাকার গর্ব মুখে করে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। কত লোক শুনেচে-কত লোক হয়তো জানত।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে এল।

কিন্তু, কাকে কথাটা জিজ্ঞেস করি?

ননী ঘোষের বাড়ি গিয়ে ননী ঘোষের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ দরকার। তাকেই একথা জিগ্যেস করতে হবে। সে নাও বলতে পারে অবশ্য–তবুও একবার জিজ্ঞেস করতে দোষ নেই।...

ননী ঘোষ বাড়িতেই ছিল। আমায় সে চেনে না, একটু তাচ্ছিল্য ও ব্যস্ততার সঙ্গে বললে –কী দরকার বাবু? বাড়ি কোথায় আপনার?

আমি বললাম–তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। ঠিক উত্তর দাও। মিথ্যে বললে বিপদে পড়ে যাবে।

ননীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম সে ভয় পেয়েছে। বুঝেছে যে, আমি গাঙ্গুলিমশায়ের খুন সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি–নিশ্চয়ই পুলিসের সাদা পোশাক-পরা ডিটেকটিভ।

সে এবার বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললে–বাবু, যা জিগ্যেস করেন, করুন।

গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা তুমি লিখতে?

ননী ইতস্তত করে বললে–তা ইয়ে–আমিও লিখিচি দু-একদিন–আর ওই গণেশ বলে একটা স্কুলের ছেলে আছে, তাকে দিয়েও–

আমি ধমক দিয়ে বললাম–স্কুলের ছেলের কথা হচ্ছে না–তুমি লিখতে কিনা?

ননী ভয়ে ভয়ে বললে–আজ্ঞে, তা লেখতাম।

কতদিন লিখচ? মিথ্যে কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে। ঠিক বলবে।

প্রায়ই লেখতাম। দু-বছর ধরে লিখচি।

আর কে লিখত?

এই যে স্কুলের ছেলে গণেশ—

তার কথা ছেড়ে দাও, তার বয়েস কত?

পনেরো-ষোলো হবে।

আর কে লিখত?

আর, সরফরাজ তরফদার লিখত, সে এখন—

সরফরাজ তরফদারের বয়েস কত? কী করত?

সে এখন মারা গিয়েছে।

বাদ দাও সে-কথা। কতদিন মারা গিয়েছে?

দু-বছর হবে।

এইবার একটা কথা জিগ্যেস করি–গাঙ্গুলিমশায়ের কত টাকা বাইরে ছিল জান?

প্রায় দু-হাজার টাকা।

মিথ্যে বোলো না। খাতা পুলিসের হাতে পড়েছে–মিথ্যে বললে মারা যাবে।

না বাবু, মিথ্যে বলিনি। দু-হাজার হবে।

ঘরে মজুত কত ছিল?

তা জানিনে!

আবার বাজে কথা? ঠিক বলো।

বাবু, আমায় মেরেই ফেলুন আর যাই করুন–মজুত টাকা কত তা আমি কী করে বলব? গাঙ্গুলিমশায় আমায় সে টাকা দেখায়নি তো? খাতায় মজুত-তবিল লেখা থাকত না।

একটা আন্দাজ তো আচে? আন্দাজ কী ছিল বলে তোমার মনে হয়?

আন্দাজ আর সাত-আট-শো টাকা।

কী করে আন্দাজ করলে?

ওঁর মুখের কথা থেকে তাই আন্দাজ হত।

গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে তুমি শেষ খাতা লিখেছিলে?

প্রায় দু-মাস আগে। দু-মাসের মধ্যে আমি খাতা লিখিনি–আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলচি। তা ছাড়া খাতা বেরোলে হাতের লেখা দেখেই তা আপনি বুঝবেন।

কোনো মোটা টাকা কি তাঁর মরণের আগে কোনো খাতকে শোধ করেছিল বলে তুমি মনে করো?

না বাবু! ঊর্ধ্বসংখ্যা ত্রিশ টাকার বেশি তিনি কাউকে ধার দিতেন না, সেটা খুব ভালো করেই জানি। মোটা টাকা মানে, দু-শো-এক-শো টাকা কাউকে তিনি কখনো দেননি।

এমন তো হতে পারে, পাঁচজন খাতকে ত্রিশ টাকা করে শোধ দিয়ে গেল একদিনে? দেড় শো টাকা হল?

তা হতে পারে বাবু, কিন্তু তা সম্ভব নয়। একদিনে পাঁচজন খাতকে টাকা শোধ দেবে না। আর একটা কথা বাবু। চাষি-খাতক সব–ভাদ্রমাসে ধান হবার সময় নয়–এখন যে চাষি প্রজারা টাকা শোধ দিয়ে যাবে, তা মনে হয় না। ওরা শোধ দেয় পৌষ মাসে–আবার ধার নেয় ধান-পাট বুনবার সময়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এ-সময় লেন-দেন বন্ধ থাকে।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কোনো কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না ননীর কাছে। তবুও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে গেল না। ননী হয় সম্পূর্ণ নির্দোষ, নয়তো সে অত্যন্ত ধূর্ত। মি. সোম একটা কথা সবসময়ে বলেন, বাইরের চেহারা বা কথাবার্তা দ্বারা কখনো মানুষের আসল রূপ জানবার চেষ্টা কোরো না করলেই ঠকতে হবে। ভীষণ চেহারার লোকের মধ্যে অনেক সময় সাধুপুরুষ বাস করে– আবার অত্যন্ত সুশ্রী ভদ্রবেশী লোকের মধ্যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ দানব-প্রকৃতির বদমাইশ বাস করে। এ আমি যে কতবার দেখেছি।

ননীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনটা একবার ভালো করে দেখবার জন্যে গেলাম।

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে একখানা মাত্র খড়ের ঘর। তার সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট রান্নাঘর। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। এসব আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

তাকে বললাম–আপনার পিতার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বার করতে পারি, আপনি খুব খুশি হবেন?

সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে–খুশি কী, আপনাকে পাঁচ-শো টাকা দেব।

টাকা দিতে হবে না। আমায় সাহায্য করুন। আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি নে।

নিশ্চয় করব। বলুন কী করতে হবে?

আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আপাতত। তারপর বলব যখন যা করতে হবে। আচ্ছা, চলুন তো বাড়ির পিছন দিকটা একবার দেখি?

বড় জঙ্গল, যাবেন ওদিকে?

জঙ্গল দেখলে তো আমাদের চলবে না–চলুন দেখি।

সত্যই ঘন আগাছার জঙ্গল আর বড়ো বড়ো বন্যগাছের ভিড় বাড়ির পেছনেই। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়ে থাকে–বিশেষ করে এই শ্যামপুরে জঙ্গল একটু বেশি। বড়ো বড়ো ভিটে লোকশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বহুকাল থেকে। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশ উৎসন্ন গিয়েছিল বিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন পাড়ায় পাড়ায় নলকূপ

হয়েছে জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে, ম্যালেরিয়াও অনেক কমেছে–কিন্তু লোক আর ফিরে আসেনি।

জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার দিনে মশার কামড় খেয়ে হাত-পা ফুলে উঠল। আমি প্রত্যেক স্থান তন্নতন্ন করে দেখলাম। সাত-আটদিনের পূর্বের ঘটনা, পায়ের চিহ্ন যদি কোথাও থাকতে পারে–তবে এখানেই তা থাকা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা দেখে হতাশ হতে হল।

জমিটা মুথে-ঘাসে ঢাকা–বর্ষায় সে ঘাস বেড়ে হাতখানেক লম্বা হয়েছে। তার ওপর পায়ের দাগ থাকা সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হল, খুনি রাত্রে এসেছিল ঠিক এই পথে। সামনের পথ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে–কখনই সে-পথে আসতে সাহস করেনি।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেও সন্দেহজনক কোনো জিনিস চোখে পড়ল না–কেবল এক জায়গায় একটা শেওড়াগাছের ডাল ভাঙা অবস্থায় দেখে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলেকে বললাম–এই ডালটা ভেঙে কে দাঁতন করেছিল, আপনি?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে আশ্চর্য হয়ে বললে–না, আমি এ-জঙ্গলে দাঁতন-কাঠি ভাঙতে আসব কেন?

তাই জিগ্যেস করচি।

আপনি কী করে জানলেন, ডাল ভেঙে কেউ দাঁতন করেছে?

ভালো করে চেয়ে দেখুন। একরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচড়ে ভেঙেচে ডালটা–তা ছাড়া এতগুলি শ্যাওড়াডালের মধ্যে একটিমাত্র ডাল ভাঙা। মানুষের হাতে ভাঙা বেশ বোঝা যাচ্চে। দাঁতনকাঠি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কী উদ্দেশ্যে এভাবে একটি ডাল কেউ ভাঙতে পারে?

আপনার দেখবার চোখ তো অদ্‌ভুত! আমার তো মশাই চোখেই পড়ত না!

আচ্ছা, দেখে বলুন তো, কত দিন আগে এ-ডালটা ভাঙা হয়েছে?

অনেক দিন আগে।

খুব বেশি দিন আগে না। মোচড়ানো-অংশের গোড়াটা দেখে মনে হয়, ছ-সাতদিন আগে। এর চেয়েও নিখুঁতভাবে বলা যায়। ওই অংশের সেলুলোজ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। আমি এই গাছের ভাঙা-ডালটা কেটে নিয়ে যাব, একটা দা আনুন তো দয়া করে?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের মুখ দেখে বুঝলাম সে বেশ একটু অবাক হয়েছে। ভাঙাদাঁতনকাঠি নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কারণ কী বুঝতে পারছে না।

সে পিছন ফিরে দা আনতে যেতে উদ্যত হলকিন্তু দু-চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের মধ্যে থেকে কী একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বললে–এটা কী?

আমি তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখলাম, সেটা একটা কাঠের ছোট্ট গোলাকৃতি পাত। ভালো করে আলোয় নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম, পাতের গায়ে একটা খোদাই কাজ। একটা ফুল, ফুলটার নীচে একটি শেয়ালের মতো জানোয়ার।

শ্রীগোপাল বললে–এটা কী বলুন তো?

আমি বুঝতে পারলাম না, কী জিনিস এটা হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। যাবার আগে শেওড়াগাছের ভাঙা ডালের গোড়াটা কেটে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি আমায় সমাদর করে বসালেনআমায় বললেন, তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হওয়া সম্ভব তা তিনি করবেন।

আমি বললাম–আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু তদন্ত করেছেন?

তদন্ত করা শেষ করেছি। তবে, আসামি বার-করা ডিটেকটিভ ভিন্ন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে।

ননী ঘোষকে আমার সন্দেহ হয়।

আমারও হয়, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হবে না।

ওকে চালান দিন না, ভয় খেয়ে যাক! খুনের রাত্রে ও অনুপস্থিত ছিল। কোথায় ছিল তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেনি।

আপনি ওকে চালান দিতে পরামর্শ দেন?

দিলে ভালো হয়। এর মধ্যে আর একটা উদ্দেশ্য আছে–বুঝেছেন নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু হেসে বললেন–এতদিন পুলিসের চাকরি করে তা আর বুঝিনি মশায়? ওকে চালান দিলে সত্যিকার হত্যাকারী কিছু অসতর্ক হয়ে পড়বে এবং যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আসবে–এই তো?

ঠিক তাই–যদিও ননী ঘোষকে আমি বেশ সন্দেহ করি। লোকটা ধূর্ত-প্রকৃতির।

কাল আমি লোকজন নিয়ে গ্রামে গিয়ে ডেকে বলব–ননীকে কালই চালান দেব।

চালান দেওয়ার সময় গ্রামের সব লোকের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

দারোগাবাবু বললেন–দাঁড়ান, একটা কথা আছে। হিসেবের খাতার একখানা পাতা সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে। পাতাখানা একবার দেখুন।

একখানা হাতচিঠে-কাগজের পাতা নিয়ে এসে দারোগাবাবু আমার হাতে দিলেন।

আমি হাতে নিয়ে বললাম–এ তো ননীর হাতের লেখা নয়!

না, এ গণেশের হাতের লেখাও নয়।

সরফরাজ তরফদারও নয়। কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে লেখা। তারিখ দেখুন।

তবে, খুনের অনেকদিন আগে এ লেখা হয়েছে–চার মাসেরও বেশি আগে।

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে মশায়। আমি একটা জিনিস আপনাকে তবে দেখাই।

দারোগাবাবুর হাতে কাঠের পাতটা দিয়ে বললাম–এ-জিনিসটা দেখুন।

দারোগাবাবু সেটা হাতে নিয়ে বললেন–কী এটা?

কী জিনিসটা তা ঠিক বলতে পারব না। তবে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। আর একটা জিনিস দেখুন।

বলে শেওড়ালের গোড়াটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন–এ তো একটা শুকনো গাছের ডাল–এতে কী হবে?

ওতেই একটা মস্ত সন্ধান দিয়েছে। জানেন? যে খুন করেছে, সে ভোর রাত পর্যন্ত গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি ছাড়েনি। ভোরের দিকে রাত পোহাতে দেরি নেই দেখে সরে পড়েছে। যাবার সময় অভ্যাসের বশে শেওড়াডালের দাঁতন করেছে।

দারোগামশায় হো হো করে হেসে উঠে বললেন–আপনারা যে দেখচি মশায়, স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন! এত কল্পনা করে পুলিশের কাজ চলে? কোথায় একটা দাঁতনকাঠির ভাঙা গোড়া!

আমি জানি আমার গুরু মি. সোম একবার একটা ভাঙা দেশলাইয়ের কাঠিকে সূত্র ধরে আসামি পাকড়েছিলেন।

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বললেন– বেশ, আপনিও ধরুন না দাঁতনকাঠি থেকে, আমার আপত্তি কী?

যদি আমি এটাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তবে এটা এতদিন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই? যে দুটো জিনিস পেয়েছি, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে–এও আমার বিশ্বাস।

কীরকম?

যে দাঁতন কাঠি ভেঙেছে–তার বা তাদের দলের লোকেরা এই কাঠের পাতখানাও।

পাতাখানা কী?

সে-কথা পরে বলব? আর একটা সন্ধান দিয়েছে এই দাঁতনকাঠিটা।

কী?

সেটা এই: দোষীর বা দোষীর দলের কারো দাঁতন করবার অভ্যেস আছে। দাঁতন করবার যার প্রতিদিনের অভ্যেস নেই–সে এ-রকম দাঁতন নিপুণভাবে মোচড় দিয়ে ভাঙতে জানবে না। এবং সম্ভবত সে বাঙালি এবং পল্লিগ্রামবাসী। হিন্দুস্থানিরা দাঁতন

করে, কিন্তু দেখবেন, তারা শেওড়াডালের দাঁতন করতে জানে না–তারা নিম, বা বাবলা গাছের দাঁতনকাঠি ব্যবহার করে সাধারণত। এ লোকটা বাঙালি এ-বিষয়ে ভুল নেই।

সেইদিনই আমি কলকাতায় মি. সোমের সঙ্গে দেখা করলাম। শেওড়ালের গোড়াটা আমি তাঁকে দেখাইনি–কাঠের পাতটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম–এটা কী বলে আপনি মনে করেন?

তিনি জিনিসটা দেখে বললেন–এ তুমি কোথায় পেলে?

সে-কথা আপনাকে এখন বলব না, ক্ষমা করবেন।

এটা আসামে মিসমি-জাতির মধ্যে প্রচলিত রক্ষাকবচ। দেখবে? আমার কাছে আছে।

মি. সোমের বাড়িতে নানা দেশের অদ্ভুত জিনিসের একটি প্রাইভেট মিউজিয়াম-মতো আছে। তিনি তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যগুলির মধ্যে থেকে সেইরকম একটা কাঠের পাত এনে আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম–আপনারটা একটু বড়ো। কিন্তু চিহ্ন একই–ফুল আর শেয়াল।

এটা ফুল নয়, নক্ষত্র– দেবতার প্রতীক, আর নীচে উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক পশু!

কোন দেশের জিনিস বললেন?

নাগা পর্বতের নানা স্থানে এ-কবচ প্রচলিত–বিশেষ করে ডিব্রু-সদিয়া অঞ্চলে।

আমি তাঁর হাত থেকে আমার পাতটা নিয়ে তারপর বললাম–এই শেওড়াডালটা ক দিনের ভাঙা বলে মনে হয়?

তিনি বললেন–ভালো করে দেখে দেব? আচ্ছা, বোসো।

সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু পরে ফিরে এসে বললেন–আট ন-দিন আগে ভাঙা।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের বাসায়।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠছে। গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করতে এবং খুনের পরে তাঁর ঘরের মধ্যে খুঁড়ে দেখতে খুনির লেগেছিল সারারাত। যুক্তির দিক থেকে হয়তো এর অনেক দোষ বার করা যাবে–কিন্তু আমি অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু ননী ঘোষকে আমি এখনও রেহাই দিইনি। শ্যামপুরে ফিরেই আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমায় দেখে ননীর মুখ শুকিয়ে গেল–তাও আমার চোখ এড়াল না।

বললাম– শোনো ননী, আবার এলাম তোমায় জ্বালাতে-কতকগুলি কথা জিগ্যেস করব।

আজ্ঞে, বলুন!

গাঙ্গুলিমশায় যেদিন খুন হন, সে-রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললে, আজ্ঞে …

বলো কোথায় ছিলে। বাড়ি ছিলে না–;

আজ্ঞে না। সামটায় শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতে সেদিন দেবনাথপুরের হাটতলায় রাত কাটাই।

কেউ দেখেচে তোমায়?

ননী বললে–আজ্ঞে, তা যদিও দেখেনি—

কেন দেখেনি।

রাত হয়ে গেল দেখে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন কেউ সেখানে ছিল না।

খেয়াঘাট পার হওনি দেবনাথপুরে?

হ্যাঁ বাবু। অনেক লোক একসঙ্গে পার হয়েছিল। আমায় তো পাটনি চিনে রাখেনি!

বাড়ি এসেছিলে কবে?

শনিবার দুপুর বেলা।

গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েচেন কার মুখে শুনলে?

আজ্ঞে, গাঁয়ে ঢুকেই মাঠে কাঁপালিদের মুখে শুনি।

কার মুখে শুনেছিলে তার নাম বলো।

আজ্ঞে, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় হীরু কাপালি–

তার কাছে গিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবে?

ননী ইতস্তত করে বললে– আজ্ঞে, ঠিক তো মনে নেই; যদি হীরু না হয়?

ননীর কথায় আমার সন্দেহ আরও বেশি হল। সে-রাত্রে ও ঘরে ছিল না, অথচকোথায় ছিল তা পরিষ্কার প্রমাণও দিতে পারছে না। গোপনে সন্ধান নিয়েআরওজানলাম, ননী সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিল। আজ দু-দিন হল এসেছে। ননীকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, ও সত্যি কথা বলবে না। একটা কিছু কান্ড ও ঘটাচ্ছে নাকি তলে তলে? কিছু বোঝা যাচ্চে না!

দু-দিন পরে শ্রীগোপাল এসে আমায় খবর দিলে, গ্রামের মহীন স্যাকরাকে সে ডেকে এনেচে–আমায় সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ কাজ আছে।

মহীন স্যাকরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর। নিতান্ত ভালোমানুষ গ্রাম্য-স্যাকরা, ঘোরপ্যাঁচ জানে না বলেই মনে হল।

শ্রীগোপালকে বললাম–একে কেন এনেচ?

এ কী বলছে শুনুন।

কী মহীন?

বাবু, ননী ঘোষ আমার কাছে এগারো ভরি সোনার তাবিজ আর হার তৈরি করে নিয়েছে –আজ তিন-চারদিন আগে।

দাম কত?

সাতাশ টাকা করে ভরি, হিসেব করুন।

টাকা নগদ দিয়েছিল?

হ্যাঁ বাবু।

সে টাকা তোমার কাছে আছে? নোট, না নগদ?

নগদ। টাকা নেই বাবু, তাই নিয়ে মহাজনের ঘর থেকে সোনা কিনে এনে গহনা গড়ি!

দু-একটা টাকাও নেই?

না বাবু।

তোমার মহাজনের কাছে আছে?

বাবু, রানাঘাটের শীতল পপাদ্দারের দোকানে কত সোনা কেনা-বেচা হচ্ছে দিনে। আমার সে টাকা কী তারা বসিয়ে রেখেছে?

শীতল পোদ্দার নাম? আমার সঙ্গে তুমি চলো রানাঘাটে আজই।

.

বেলা তিনটের ট্রেনে মহীন স্যাকরাকে নিয়ে রানাঘাটে শীতল পোদ্দারের দোকানে হাজির হলাম। সঙ্গে মহীনকে দেখে বুড়ো পোদ্দারমশায় ভাবলে, বড়ো খরিদ্দার একজন এনেচে মহীন। তাদের আদর-অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা করে আমি আসল কাজের কথা পাড়লাম, একটু কড়া–রুক্ষস্বরে।

বললাম– সেদিন এই মহীন আপনাদের ঘর থেকে সোনা কিনেছিল এগারো ভরি?

পোদ্দারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল ভয়ে–ভাবলে, এ নিশ্চয়ই পুলিশের হাঙ্গামা! সে ভয়ে ভয়ে বললে–হ্যাঁ বাবু, কিনেছিল।

টাকা নগদ দেয়?

তা দিয়েছিল।

সে টাকা আছে?

না বাবু, টাকা কখনো থাকে? আমাদের বড়ো কারবার কোথাকার টাকা কোথায় গিয়েছে!

আমিও ওকে দেখানোর জন্যে কড়া সুরে বললাম–ঠিক কথা বলো। টাকা যদি থাকে আনিয়ে দাও তোমার ভয় নেই! চুরির ব্যাপার নয়, মহীনের কোনো দোষ নেই। তোমাদের কোনো পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে না– কেবল কোর্টে সাক্ষী দিতে হতে পারে। টাকা বার করো।

মহীনও বললে– পোদ্দারমশায়, আমাদের কোনো ভয় নেই, বাবু বলেচেন। টাকা যদি থাকে, দেখান বাবুকে।

পোদ্দার বললে–কিন্তু বাবু, একটা কথা। টাকা তো সব সমান, টাকার গায়ে কি নাম লেখা আছে?

সে-কথায় তোমার দরকার নেই। নাম লেখা থাক না থাক–টাকা তুমি বার করো।

.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীতল পোদ্দার টাকা বার করে নিয়ে এল একটা থলির মধ্যে থেকে। বললে– সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল। সোনা বিক্রির তহবিল আমাদের আলাদা থাকে, কারণ, এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয়। টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বললে– যা আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হল। সে বললে–বাবু, এগুলো পুরোনো টাকা, পোঁতা-টোতা ছিল বলে মনে হয়, এ চুরির টাকা নয়।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে! মহীন স্যাকরার মুখ দেখি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম–তুমি কী করে জানলে এ পুরোনো টাকা?

দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে! পুরোনো কলঙ্ক-ধরা রুপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু। এই নিয়ে কারবার করচি যখন!

কতদিনের পুরোনো টাকা এ?

বিশ-পঁচিশ বছরের।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, বিশ বৎসরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই। বললাম–মাটিতে পোঁতা টাকা বলে ঠিক মনে হচ্চে?

নিশ্চয়ই বাবু। পেতলের হাঁড়িতে পোঁতা ছিল। পেতলের কলঙ্ক লেগেচে টাকার গায়ে।

আচ্ছা, তুমি এ-টাকা আলাদা করে রেখে দাও। আমি পুলিশ নই, কিন্তু পুলিশ শিগগির এসে এ-টাকা চাইবে মনে থাকে যেন।

শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বললে- দোহাই বাবু, দেখবেন, যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। কোনো দোষে দোষী নই বাবু, মহীন আমার পুরোনো খাতক আর খদ্দের, ও কোথা থেকে টাকা এনেচে তা কেমন করে জানব বাবু, বলুন?

মহীনকে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম। দেখি, ও ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বললাম–কী মহীন তোমার ভয় কী? তুমি গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করনি তো?

মহীন বললে–খুন? গাঙ্গুলিমশায়কে? কী যে বলেন বাবু?

দেখলাম ওর সর্বশরীর যেন থরথর করে কাঁপছে।

কেন, ওর এত ভয় হল কীসের জন্যে?

আমরা ডিটেকটিভ, আসামি ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু বলে ভাবা আমাদের স্বভাব নয়। মি. সোম আমার শিক্ষাগুরু–তাঁর একটি মূল্যবান উপদেশ হচ্ছে, যে-বাড়িতে খুন হয়েছে বা চুরি হয়েছে– সে বাড়ির প্রত্যেককেই ভাববে খুনি ও চোর। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে, তবে খুনের কিনারা করতে পারবে–নতুবা পদে পদে ঠকতে হবে।

ননী ঘোষ তো আছেই এর মধ্যে, এ-সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হল। বিশেষ করে টাকা দেখবার পরে আদৌ সে-সন্দেহ না থাকবারই কথা।

কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হল।

এই মহীন স্যাকরার সঙ্গে খুনের কী কোনো সম্পর্ক আছে?

কথাটা ট্রেনে বসে ভাবলাম। মহীনও কামরায় একপাশে বসে আছে। সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি–জানলা দিয়ে পান্ডুর বির্বণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মহীনের যোগাযোগে ননী ঘোষ খুন করেনি তো? দুজনে মিলে হয়তো এ-কাজ করেছে। কিংবা এমনও কী হতে পারে না যে, মহীনই খুন করেছে, ননী ঘোষ নির্দোষ?

তবে একটা কথা, ননী ঘোষের হাতেই খাতাপত্র–কত টাকা আসচে-যাচ্চে, ননীই তো জানত, মহীন স্যাকরা সে-খবর কী করে রাখবে!...

তখুনি একটা কথা মনে পড়ল। গাঙ্গুলিমশায় ছিলেন সরলপ্রাণ লোক, যেখানে-সেখানে নিজের টাকাকড়ির গল্প করে বেড়াতেন, সবাই জানে।

মহীনকে বললাম তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে যায়, না?

মহীন যেন চমকে উঠে বললে–হ্যাঁ বাবু।

গাঙ্গুলিমশায়ও যেতেন?

তা যেতেন বই কী বাবু।

গিয়ে গল্প-টল্প করতেন?

তা করতেন বই কী বাবু!

টাকাকড়ির কথা কখনো বলতেন তোমার দোকানে বসে?

সেটা তো তাঁর স্বভাব ছিল– সে-কথাও বলতেন মাঝে মাঝে।

ননী ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল?

আমার দোকানে আসত গহনা গড়াতে। আমার খদ্দের। এ থেকে যা আলাপ–তা ছাড়া সে আমার গাঁয়ের লোক। খুব মাখামাখি ভাব আর এমন কী থাকবে? যেমন থাকে।

তুমি আর ননী দু-জনে মিলে গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করে টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েচ–কেমন কী না?

এই প্রশ্ন করেই আমি ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। ভয়ের রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে! ও আমার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে বললে–কী যে বলেন

বাবু! আমি বেহ্মহত্যার পাতক হব টাকার জন্যে! দোহাই ধর্ম, আপনাকে সত্যিকথা বলছি বাবু!

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কেউ-কেউ থাকে, নিপুণ ধরনের স্বাভাবিক অভিনেতা। তাদের কথাবার্তা, হাবভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়–এ আমি কতবার দেখেছি।

শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীগোপাল বললে–থানা থেকে দারোগাবাবু আর ইনস্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

তুমি গহনার কথা কিছু বললে নাকি তাঁদের?

না। আমি কেন সে-কথা বলতে যাব। আমাকে কোনো কথা তো বলে দেননি?

বেশ করে।

ওঁরা আপনার সেই কাঠের তক্তামতো-জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন।

কেন?

সে-কথা কিছু বলেননি।

তাঁরা ও দেখে কিছু করতে পারেন, আমি তাঁদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁরা পারবেন বলে আমার ধারণা নেই।

বিকেলের দিকে আমি নির্জনে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। ... আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসমিজাতির কাষ্ঠনির্মিত রক্ষাকবচের সঙ্গে এই খুনির যোগ আছে। সেই রক্ষাকবচ প্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, আমার কাছে সেটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে উঠছে ক্রমশ।

ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেচে, যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। শীতল পোদ্দারের দোকানের টাকার কথা যদি পুলিশকে বলি, তবে তারা এখুনি ননীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সেদিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে, সে-টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহীনকে, তার প্রমাণ কী?

মহীনের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই!

শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে!

হয়তো এমনও হতে পারে, মহীন স্যাকরাই আসল খুনি। তার দোকানে বসে গাঙ্গুলিমশায় কখনো টাকার গল্প করে থাকবেন–তারপর সুবিধে পেয়ে মহীন গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করেছে, পোঁতা-টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে…

ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম।

ওকে দেখেই কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হল, লোকটার মধ্যে কোথায় কী গলদ আছে, ও খুব সাচ্চা লোক নয়। আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায়।

লোকটা ধূর্তও বটে। ওর চোখ-মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম–তুমি মহীনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েছ সম্প্রতি?

ননী বিবর্ণমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে–হ্যাঁ–তা–হ্যাঁ বাবু—

অত টাকা হঠাৎ পেলে কোথায়?

হঠাৎ কেন বাবু! আমরা তিনপুরুষে ঘি-মাখনের ব্যাবসা করি। টাকা হাতে ছিল তা ভাবলাম, নগদ টাকা পাড়াগাঁয়ে রাখা—

টাকা নগদ দিয়েছিলে, না নোটে?

নগদ।

সব টাকা তোমার ঘি-মাখন বিক্রির টাকা?

হ্যাঁ বাবু।

ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরোলাম। ননী অত্যন্ত ধূর্ত লোক, ওর কাছ থেকে কথা বার করা চলবে না দেখা যাচ্চে।

বেড়াতে বেড়াতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির কাছে গিয়ে পড়েছি, এমন সময় দেখি কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন।

আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বললে–এই যে! আসুন, চা খাবেন।

www.bengaliebook.com

না, এখন খাব না। ব্যস্ত আছি।

আসুন, আলাপ করিয়ে দিই…ইনি সুশীল রায়, আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া, আমাদের পাড়ার জামাই–আমার বাড়ির পাশের ওই বুড়ি-দিদিমার জামাই। উনিও একটু-একটু–মানে–ওঁকে সব বলেছিলাম।

আমি বুঝলাম, জানকী বড়ুয়া আর যাই হোক, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠল শ্রীগোপালের প্রতি। সে আমার ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, এবং কোথা থেকে আর-একজন গোয়েন্দা আমদানি করে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল, আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েছে।

আমি জানকীবাবুকে বললাম–আপনি কী বুঝচেন?

কী সম্বন্ধে?

খুন সম্বন্ধে।

কিছুই না। তবে আমার মনে হয়–

কী, বলুন?

এখানকার লোকই খুন করেছে।

আপনি বলছেন–এই গাঁয়ের লোক?

এই গাঁয়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ-কাজ হয়নি। ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার মনে কী হয়?

আমি বিস্মিতভাবে জানকীবাবুর মুখের দিকে চাইলাম। তাহলে শ্রীগোপাল দেখচি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেচে! ভারি রাগ হল শ্রীগোপালের ব্যবহারে।

আমার ওপর তাহলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখছি।

একবার মনে হল, জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেব না। অবশেষে ভদ্রতাবোধেরই জয় হল। বললাম–ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বললে?

কেন, শ্রীগোপালের মুখে সব শুনেছি।

আপনি তাকে সন্দেহ করেন?

খুব করি। তার সঙ্গে এখুনি দেখা করা দরকার। তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হত…

দেখুন না, ভালোই তো।

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বলেন–আচ্ছা, আপনি ঘটনাস্থলে ভালো করে খুঁজেছিলেন?

খুঁজেছিলাম বই কী।

কিছু পেয়েছিলেন?

আমি জানকীবাবুর এ-প্রশ্নে দস্তুরমতো বিস্মিত হলাম। যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য-একজন সমব্যবসায়ী লোককে একথা জিগ্যেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন আগে-থেকেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি।

আমি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম–না। এমন বিশেষ কিছু না।

জানকীবাবু পুনরায় জিগ্যেস করলেন–তাহলে কিছুই পাননি?

কিছুই না তেমন।

কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার আমার ইচ্ছে হল না। জানকীবাবুকে বলে কী হবে? তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কী? মি. সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল? মি. সোমের মতো পন্ডিত ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশি নেই এদেশে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জানকীবাবু চলে গেল আমি শ্রীগোপালকে বললাম–তুমি একে কী বলেছিলে?

কী বলব!

ননী ঘোষের কথা বলেচ?

হ্যাঁ, তা বলেছি।

আমি ওকে তিরস্কারের সুরে বললাম–আমাকে তোমার বিশ্বাস না হতে পারে–তা বলে আমার আবিষ্কৃত ঘটনা-সূত্রগুলি তোমার অন্য ডিটেকটিভকে দেওয়ার কী অধিকার আছে?

শ্রীগোপাল চুপ করে রইল। ওর নির্বুদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করলাম।

.

নবম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহীন স্যাকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। মহীন আমায় দেখে ভয়ে-ভয়ে একটা টুল পেতে দিল বসবার জন্যে।

আমি বললাম–মহীন, একটা সত্যি কথা বলবে?

কী, বলুন!

তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে?

মহীন আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে–ননী বলেচে বুঝি? সব মিথ্যে কথা ওর বাবু, সব মিথ্যে।

আমি কড়াসুরে বললাম–ঝগড়া হয়েছিল তাহলে? সত্যি বলো!

মহীন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বললে–হয়েছিল বাবু, কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ…

আমি সে-কথা বলিনি–ঝগড়া হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করচি।

হ্যাঁ বাবু।

কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বলো এবার!

সোনার দর নিয়ে বাবু।

আচ্ছা, তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এইজন্যে বলেছিল –কেমন, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ বাবু।

তুমি তখন ভেবেছিল যে ননী ঘোষই খুন করেছে?

তা—না–

ঠিক বলো।

না বাবু।

তাহলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত; তাই ভাবচ বুঝি?

মহীন স্যাকরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, বললে–বাবু, তা–তা—

তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে থানায় খবর দেব!

মহীন আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে– দোহাই বাবু, আমার সব কথা শুনুন আগে। আপনি দেশের লোক–আমার সর্বনাশ করবেন না বাবু-কাচ্চা-বাচ্চা মারা যাবে।

কী, বলো!

তখন আমিও লুটের টাকা বলে সন্দেহ করিনি। কী করে করব! বলুন বাবু, তা কি সম্ভব?

তবে, কখন সন্দেহ করলে?

বাবু, শ্রীগোপালই আমায় বললে, আপনি ননী ঘোষকে সন্দেহ করেন। তখন আমি ভাবলাম, গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাব এর পরে। তাই বলেছিলাম।

শ্রীগোপালের নির্বুদ্ধিতা দেখছি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদি ওর বাবার খুনের আসামি ধরা না পড়ে, তবে সেটা ওর নির্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে।

.

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা শ্রীগোপালকে বলবার জন্যে তার বাড়ির দিকে চললাম।

রাস্তাটা বাড়ির পেছনের দিকে–শিগগির হবে বলে শট-কার্ট করে গেলাম বনের মধ্যে দিয়ে। সেই বন– যেখানে আমি সেদিন মিসমি-জাতির কবচ ও দাঁতনকাঠির গোড়া সংগ্রহ করেছিলাম।

অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা সাদা-মতো কী কিছু দূরে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিনিসটা নড়চে-চড়চে আবার। অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম করে দিলে।

এই বনের পরেই গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি–গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত নাকি রে বাবা!

হঠাৎ একটা টর্চ জ্বলে উঠল–সঙ্গেসঙ্গে কে কড়া-গলায় হাঁকলে, কে ওখানে?

আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম– কে আপনি?

আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা মনুষ্যমূর্তি এবং টর্চের আলো-আঁধার কেটে গেলে দেখলাম, সে জানকীবাবু ডিটেকটিভ!

বিস্ময়ের সুরে বললাম–আপনি কী করছিলেন অন্ধকারে বনের মধ্যে?

জানকীবাবু অপ্রতিভ সুরে বললেন–আমি এই—এই—

ও, বুঝেচি। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে।

না না, কিছু না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে। ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয়, যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্তও হয়ে পড়েছেন। কী মুশকিল! এসব পাড়াগাঁয়ে শহরের মতো বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যিই অনেকের বড়োই অসুবিধে হয়।

জানকী বড়ুয়া প্রাইভেট-ডিটেকটিভকে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত বলে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেল। ভদ্রলোককে কী বিপন্নই করে তুলেছিলাম!

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীগোপালের বাড়ি বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকেও চা দেওয়া হল। জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিশি

লোক, চা খেতে খেতে তিনি নানা মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন। আমায় বললেন–আমি তো মশায় গাঁয়ের জামাই, আজ চোদ্দো বছর বিয়ে করেচি, কাকে না চিনি বলুন গ্রামে, সকলেই আমার আত্মীয়।

আমি বললাম–আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন? তাহলে তো হবেই আত্মীয়তা!

আমার স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বছর তিনেক। তারপর আমি প্রায়ই আসি না। তবে শাশুড়িঠাকরুন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, আমায় আসার জন্যে চিঠি লেখেন, না এসে পারিনে।

ছেলেপুলে কী আপনার?

একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েছে। এখন আর কিছুই নেই।

ও।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন–আচ্ছা, গাঙ্গুলিমশায়ের খুন সম্বন্ধে পুলিস কোনো সূত্র পেয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

কেন বলুন তো?

আমার বিশেষ কৌতূহল এ-সম্বন্ধে। গাঙ্গুলিমশায় আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন। বড়ো স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর খুনের ব্যাপারে একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে কোনো অহংকার নেই মশায়। আমি এ খুনের কিনারা করি, বা আপনি করুন, বা পুলিশই করুক, আমার পক্ষে সব সমান। যার দ্বারা হোক কাজ হলেই হল। নাম আমি চাইনে।

নাম কে চায় বলুন? আমিও নয়।

তবে আসুন-না আমরা মিলে-মিশে কাজ করি? পুলিশকেও বলুন।

পুলিশ তো খুব রাজি, তারা তো এতে খুব খুশি হবে।

বেশ, তবে কাল থেকে—

আমার কোনো আপত্তি নেই।

আচ্ছা, প্রথম কথা–আপনি কোনো কিছু সূত্র পেয়েছেন কিনা আমায় বলুন। আমি যা পেয়েছি আপনাকে বলি।

আমি এখানে এখন বলব না। পরে আপনাকে জানাব।

ননী ঘোষের ব্যাপারটা আপনি কী মনে করেন?

সেদিন তো আপনাকে বলেচি। ওকে আমার সন্দেহ হয়। আপনি ওকে সন্দেহ করেন?

নিশ্চয় করি।

আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

সেই গহনা ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ।

তা আমারও মনে হয়েছে, কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট।

মহীন স্যাকরাকে নিয়ে তো? আমি মহীনকে সন্দেহ করিনে।

কেন বলুন তো?

মহীন তো খাতা লিখত না গাঙ্গুলিমশায়ের। ভেবে দেখুন কথাটা।

সে-সব আমিও ভেবেচি। তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

চলুন না, দু-জনে একবার ননীর কাছে যাই।

তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

হিসেবের খাতাখানা কোথায়?

পুলিশের জিম্মায়।

আপনি ভালো করে দেখেচেন খাতাখানা?

দেখেচি বলেই তো ননীকে জড়াতে পারি নে ভালো করে।

কেন?

শুধু ননীর হাতের লেখা নয়, আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে।

কার কার?

জানকীবাবু ব্যথভাবে এ-প্রশ্নটা করে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন। আমি মৃত-মুসলমান ভদ্রলোকটির ও স্কুলের ছাত্রটির কথা তাঁকে বললাম। জানকীবাবু বললেন–ও, এই! সে তো আমি জানি–শ্রীগোপালের মুখে শুনেছি।

যা শুনেছেন, তার বেশি আমারও কিছু বলবার নেই।

পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হল। বললে–বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কী?

জানকীবাবু এ-গাঁয়ের জামাই বলে খাতির করি। কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যে-রকম গালমন্দ দিয়ে এসেছেন, তাতে আমি বড়ো দুঃখিত। বাবু, যদি দোষ করে থাকি, পুলিশে দিন–গালমন্দ কেন?

তুমি বড়ো চালাক লোক ননী। আমি সব বুঝি। পুলিশে দেবার হলে, তোমাকে একদিনও হাজতের বাইরে রাখব ভেবেচ।

বাবুও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-খুন যেই করুক, ননী তার মধ্যে নিশ্চয়ই জড়িত। অথচ ও ভেবেচে যে, আমার চোখে ধুলো দেবে!

বললাম–সে-কথা এখন নয়। এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে।

বাবু, আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন, ধর্ম যতদিন মাথার উপর আছে—

ধূর্ত লোকেরাই ধর্মের দোহাই পাড়ে বেশি! লোকটার উপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

.

সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম! তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি না–অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না এবং বোধ হয়

সেইজন্যই সেই রাতে আমার প্রাণ বেঁচে গেল।

ব্যাপারটা কী হল খুলে বলি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আবার থেমে যাচ্চে, অথচ গুমট কাটেনি। আমার ঘরটার উত্তর দিকে একটা মাত্র কাঠের গরাদ দেওয়া জানলা, জানলার সামনাসামনি দরজা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে জানলা নেই–একটা ঘুলঘুলি আছে মাত্র।

রাত প্রায় একটা কী তার বেশি। আমার ঘুম আসেনি, তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেচে।

হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নীচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল! গোরু কী ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয়–বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না।

তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামল। তখনও আমি ভাবচি, ওটা গোরুর পায়ের শব্দ। এমন সময় আমার বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে–ঠিক বুকের ওপর এসে পৌঁছোলো–হাতে ধারালো একখানা সোজা-ছোরা, অন্ধকারেও যেন ঝকঝক করছে!

ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি পাশমোড়া দিয়ে ছোরা-সমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম।

পরক্ষণেই কে এক জোর ঝটকায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। সঙ্গেসঙ্গে ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কবজি ও বুকের খানিকটা চিরে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জ্বেলে দেখি, বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। তখুনি নেকড়া ছিঁড়ে হাতে জলপটি বেঁধে লণ্ঠন জ্বালোম।

লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষাস্ত্র ছোরা বাঁধা ছিল–আমার বুক লক্ষ করে ঠিক কুড়লের কাপের ধরনে লাঠি উঁচিয়ে কোপ মারলেই ছোরা পিঠের ওদিক দিকে ছুঁড়ে বেরোতো। তারপর বাঁধন আলগা করে ছোরাখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার ওপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেচি, একথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল করে বোঝানো চলত।

আমি নিরস্ত্র ছিলাম না–মি. সোমের ছাত্র আমি। আমার বালিশের তলায় ছ-নলা অটোমেটিক ওয়েবলি লুকোনো। সেটা হাতে করে তখুনি বাইরে এসে টর্চ ধরে ঘরের সর্বত্র খুঁজলাম–জানালার কাছে জুতোসুদ্ধ টাটকা পায়ের দাগ।

ভালো করে টর্চ ফেলে দেখলাম।

কী জুতো? … রবার-সোল, না, চামড়া? … অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।

এখুনি এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার। কিন্তু তার কোনো উপকরণ দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমার কাছে নেই।

আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগল, আকাশের দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী।

এমনি রাত্রে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছিলেন।

আমি শ্রীগোপালের বাড়ি গিয়ে ডাকলাম–শ্রীগোপাল, শ্রীগোপাল, ওঠো–ওঠো!

শ্রীগোপাল জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে–কে?

–বাইরে এসো–আলো নিয়ে এসো–সব বলছি।

শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিস্মিতমুখে বার হয়ে এসে বললে–কে? ও, আপনি? এত রাত্রে কী মনে করে?

চলো বসি–সব বলছি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!

চা খাবেন? স্টোভ আছে। চা-খোর আমি, সব মজুত রাখি–করে দিই।

চা খেয়ে আমি আর বসতে পারছি না। ঘুমে যেন চোখ ঢুলে আসচে! শ্রীগোপাল বললে– বাকি রাতটুকু আমার এখানেই শুয়ে কাটিয়ে দেবেন-এখন।

ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বললে–এর মধ্যে ননী আছে বলে মনে হয়। এ তারই কাজ।

না।

না? বলেন কী?

না, এ ননীর কাজ নয়।

কী করে জানলেন?

এখানকার লোক ছোরার ব্যবহার জানে না–বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে ছোরার ব্যবহার নেই।

তবে?

এ-কাজ যে করেচে সে বাংলার বাইরে থাকে। তুমি কাউকে রাতের কথা বোলো না কিন্তু!

আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য?

আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিশকে সাহায্য করচি–এ ছাড়া আর অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

.

ভোর হল। আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম।

জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনি রয়েছে। রবার-সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ক-নম্বরের জুতো তাও জানা গেল।

বিকেলে আমি ভাবলাম, একবার মামার বাড়ি যাব। এ-গ্রামে ডাক্তার নেই ভালো– মামার বাড়ি গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসব। ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে মনে হল–আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল।

www.bengaliebook.com

কিছুই থাকে না ঘরে। একটা ছোটো চামড়ার সুটকেস–তাতে খানকতক কাপড়-জামা। কে ঘরের মধ্যে ঢুকে সুটকেসটা মেঝেতে ফেলে তার মধ্যে হাতড়ে কী খুঁজেচে-কাপড় জামা, বা, একটা মানিব্যাগে গোটা-দুই টাকা ছিল যেগুলি ছোঁয়নি। বালিশের তলা–এমনকী, তোশকটার তলা পর্যন্ত খুঁজেছে।

আমি প্রথমটা ভাবলাম, এ কোনো ছিঁচকে চোরের কাজ। কিন্তু চোর টাকা নেয়নি–তবে কি, রিভলবারটা চুরি করতে এসেছিল? সেটা আমার পকেটেই আছে অবশ্যি–সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বললাম। জানকীবাবু শুনে বললেন–চলুন, জায়গাটা একবার দেখে আসি।

ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভালো করে খুঁজে দেখলাম। সব ঠিক আছে। জানকীবাবু আমার চেয়েও ভালো করে খুঁজলেন, তিনিও কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হল না।

বললাম–দেখলেন তো?

টাকাকাড়ি কিছু যায়নি?

কিছু না।

আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল?

কী জিনিস?

অন্য কোনো দরকারি–ইয়ে–মানে–মূল্যবান?

এখানে মূল্যবান জিনিস কী থাকবে?

তাই তো!

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। মিসমিদের সেই কবচ আর দাঁতনকাঠির টুকরোটা আমি এই ঘরে কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম, কিন্তু কাল কী মনে করে শ্রীগোপালের বাড়ি যাবার সময় সে-জিনিস দু-টি আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম–এখনও পর্যন্ত সে দু-টি আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি বলি করেও বলা হল না।

জানকীবাবু যাবার সময় বললেন–ননীর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

www.bengaliebook.com

হয় খানিকটা।

একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি।

এখন নয়। আমি মামার বাড়ি যাই, তারপর ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ি চলে এলাম।

.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার মামার বাড়ির পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ি। সে আমার সমবয়সি–গ্রামে প্র্যাকটিস করে। মোটামুটি যা রোজগার করে, তাতে তার চলে যায়। ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আবার শ্রীগোপালদের গ্রামেই ফিরলাম। জানকীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বোধ হয় বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমায় বললেন–আজই ফিরলেন?

তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, মিসমিদের কবচখানা আমার পকেটেই আছে এখনও–সামনে রাত আসচে আবার, ও-জিনিসটা সঙ্গে এনে ভালো করিনি, মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধ হয়।

জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয়, জিনিসটা দেখিয়ে?

কিন্তু ভাবলাম, এ-জিনিসটা ওঁর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওই সঙ্গে। হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না–দরকার কী দেখানোর?

জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ি শ্রীগোপালের বাড়ির পাশেই।

ওর বৃদ্ধা শাশুড়ি, দেখি বাইরের রোয়াকে বসে মালা জপ করছেন। আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করবার জন্যে সেখানে গিয়ে বসলাম।

বুড়ি বললে–এসো দাদা, বোসো।

ভালো আছেন, দিদিমা?

আমাদের আবার ভালোমন্দ–তোমরা ভালো থাকলেই আমাদের ভালো।

আপনি বুঝি একাই থাকেন?

আর কে থাকবে বল–আছেই-বা কে? এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েছে।

তবে তো আপনার বড়ো কষ্ট, দিদিমা!

কী করব দাদা, অদেষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ কি ঠেকাতে পারে?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ির সামনের গোয়ালের ছিটেবেড়ায় একটা অদ্‌ভুত জিনিস রয়েছে–জিনিসটা হচ্ছে, খুব বড়ো একটা পাতার টোকা। পাতাগুলো শুকনো তামাক-পাতার মতো ঈষৎ লালচে। পাতার বোনা ওরকম টোকা, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কখনো দেখিনি।

জিজ্ঞেস করলাম–দিদিমা, ও জিনিসটা কী? এখানে তৈরি হয়?

বৃদ্ধা বললেন–ওটা এ-দেশের নয় দাদা!

কোথায় পেয়েছিলেন ওটা?

আমার জামাই এনে দিয়েছিল।

আপনার জামাই? জানকীবাবু বুঝি?

হ্যাঁ দাদা। ও আসামে চ-বাগানে থাকত কিনা, ওই আর বছর এনেছিল।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল... আসাম! ...চা বাগান! এই ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কীভাবে স্থাপিত হতে পারে–এ আমার নিকট একটা মস্ত-বড়ো সমস্যা। একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেছে।

আমি বললাম–জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন?

হ্যাঁ দাদা, অনেকদিন ছিল। এখন আর থাকে না। আমার সে-মেয়ে মারা গিয়েছে কিনা! তবু জামাই মাঝে মাঝে আসে। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বড়ো ভাব ছিল। এলেই ওখানে বসে গল্প, চা খাওয়া–

ও!

বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কী দুঃখু!

গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর ক-দিন পরে এলেন উনি?

তিন-চার দিন পরে দাদা!

আপনার মেয়ে মারা গিয়েছেন কতদিন হল দিদিমা?

তা, বছর-তিনেক হল–এই শ্রাবণে।

মেয়ে মারা যাওযার পর উনি যেমন আসছিলেন, তেমনই আসতেন, না, মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল?

বছর-দুই আর আসেনি। মন তো খারাপ হয়, বুঝতেই পার দাদা! তারপর এল একবার শীতকালে। এখানে রইল মাসখানেক। বেশ মন লেগে গেল। সেই থেকে প্রায়ই আসে।

আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সেদিন আর কোথাও বেরোলাম না। পরদিন সকালে উঠে স্থির করলাম একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিশেষ আবশ্যক।

পথেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা। আমায় জিজ্ঞেস করলেন–এই যে! বেড়াচ্ছেন বুঝি?

আমি বললাম–চলুন, ঘুরে আসা যাক একটু। আপত্তি আছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না যাই।

আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, খানিকটা করিও বটে, খানিকটা নাও বটে। কেন বলুন তো?

আমার নিজের ওতে একেবারেই বিশ্বাস নেই। তাই বলছি। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেচেন, আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কান্ড করলেন, যাতে আমি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে।

.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কান্ডটা এমন কিছুই নয়, খুবই সাধারণ।

জানকীবাবু পথের পাশে ঝোঁপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বললেন–দাঁড়ান, একটা দাঁতন ভেঙেনি। সকাল বেলাটা..

তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে একটা শ্যাওড়াডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতনকাঠির জন্যে।

আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

পরক্ষণেই আমি সামলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা-শ্যাওড়াডালটা ভালো করে লক্ষ করে দেখি, সঙ্গে সেদিনকার সেই দাঁতনকাঠির শুকনো গোড়াটা এনেছিলাম।

যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েছে, এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাঙা!

কোনো তফাত নেই।

আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। আসাম, দাঁতনকাঠি–দুটো অতিসাধারণ, অথচ অত্যন্ত অদ্‌ভুত সূত্র।

জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধরে ঘনঘন আসা-যাওয়া, পত্নীবিয়োগ সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি আসার তাগিদ, গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

মি. সোম একবার আমায় বলেছিলেন, অপরাধী বলে যাকে সন্দেহ করবে, তখনতার পদমর্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা–এমনকী, সম্বন্ধ, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না।

জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগল মনে।

একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত দরকারি একটা সূত্র।

সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায়।

দারোগাবাবু আমায় দেখে বললেন–কী? কোনো সন্ধান করা গেল?

করে ফেলেছি প্রায়। এখন–যে-খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে, সেই খানা একবার দরকার।

ব্যাপার কী, শুনি?

এখন কিছু বলচিনে! হাতের লেখা মেলানোর ব্যাপার আছে একটা।

কীরকম?

গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা লিখত যে-ক-জন–তাদের সবার হাতের লেখা জানি, কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব–তাই না?

সে তো আমিই আপনাকে বলি।

এখন সেই লোক কে হতে পারে, তার একটা আন্দাজ করে ফেলেচি। তার হাতের লেখার সঙ্গে এখন সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

লোকটার বর্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধে হবে?

জোগাড় করতে চেষ্টা করছি। যদি মেলে, আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

আমায় বলবেন, আমি গিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসব ওয়ারেন্ট বের করিয়ে নিতে যা দেরি।

বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে।

সে ভাববেন না, যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে, তবে বাকি সব আমি করে নেব। এই কাজ করচি আজ সতেরো বছর।

আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ করে বসে রইলাম না। এসব ব্যাপারে দেরি করতে নেই, করলেই ঠকতে হয়। জানকীবাবুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েছেন কোথাকার পুকুরে–আর মাত্র দু-দিন তিনি এখানে আছেন–এই দু-দিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে।

আমি বললাম–দিদিমা, জানকীবাবু আপনাকে কিছু কিছু টাকা পাঠান শুনেচি?

না দাদা, ও-কথা কার কাছে শুনেচ? জামাই তেমন লোকই নয়।

পাঠান না?

আরও উলটে নেয় ছাড়া দেয় না। মেয়ে থাকতে তবুও যা দিত, এখন একেবারে উপুড় হাতটি করে না কোনোদিন।

যাক চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেন তো–তাহলে হল।

তাও কখনো কখনো। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা লেখে।

খাম, না পোস্টকার্ড?

হ্যাঁ, খাম না রেজিস্টারি চিঠি। তুমিও যেমন দাদা! মেয়ে বেঁচে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায়। তার উপর কি কোনো দাবি থাকে দাদা? দু-লাইন লিখে সেরে দেয়।

কই, দেখি? আছে নাকি চিঠি?

ওই চালের বাতায় গোঁজা আছে, দেখো না।

খুঁজে খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরোনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে বের করে বৃদ্ধাকে পড়ে শোনালুম। বৃদ্ধা বললেন–ওই চিঠি দাদা।

আরও দু-একটা কথা বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে করে। জানকীবাবু যদি একথা এখন শুনতেও পান যে, তাঁর লেখা চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই।

থানায় দারোগার সামনে বসে হাতের লেখা দুটো মেলানো হল।

অদ্ভুত ধরনের মিল। দু-একটা অক্ষর লেখার বিশেষ ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একইরকম।

.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারোগাবাবু বললেন–তবুও একজন হাতের লেখা-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি?

সে তো কোর্টে প্রমাণের সময়। এখন ওসব দরকার নেই। আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন।

আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন।

একে-একে সব বলব–তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

মি. সোমের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায়। সব বললাম তাঁকে খুলে।

তিনি বললেন–একটা কথা বলি। তোমাদের সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ-সূত্রাদির চেয়েও একটা বড়ো জিনিস আছে। এটা সূত্র ধরে অপরাধী বের করতে বড় সাহায্য করে। অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সেটা হল–অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক, Chance-এর আঁক কষে বোঝা যায় যে, একজন লোক যে আসামে থাকে বলবে, অথচ দাঁতন করবে, অথচ তার হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্চে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে, এ ধরনের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে। এক্ষেত্রে যে সে-রকম ঘটেছে, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই–সুতরাং ধরে নিতে হবে ও সেই লোকই।

সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম। আসবার সময় একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বললেন, আপনি লোক পাঠালেই আমি সব ব্যবস্থা করব।

ওয়ারেন্ট বার হয়েছে?

এখনও হস্তগত হয়নি, আজ-কাল পেয়ে যাব।

গ্রামে ফিরে দু-তিন দিন চুপচাপ বসে রইলাম শ্রীগোপালের বাড়িতে। খবর নিয়ে জানলাম, জানকীবাবু দু-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন। থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে বলে দিলাম।

পকেটে মিসমিদের কবচখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই। জানকীবাবুকে কৌশল করে নির্জনে গাঁয়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম।

আজ একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হয় এসপার, নয় ওসপার!

জানকীবাবু বললেন–আপনার কাজ কতদূর এগোলো?

এক পাও না। আপনি কী বলেন?

আমি তো ভাবচি, ননীর সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলব।

সন্দেহের কারণ পেয়েছেন?

না পেলে কি আর বলচি?

আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি বুঝি আসামে ছিলেন?

কে বললে?

আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে।

না, আমি কখনো আসামে ছিলাম না। যিনি বলেচেন, তিনি জানেন না।

আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হল। জানকীবাবু একথা বলতে চান কেন? তবে কি তিনি মিসমিদের কবচ হারানো এবং বিশেষ করে সেখানা যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিশের কোনো সুযোগ্য ডিটেকটিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

আমি তখন আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেচি। বললাম।–মানে, অন্য কেউ বলেনি, আপনার দেওয়া একটা পাতার টোকা সেদিন আপনার শ্বশুরবাড়িতে দেখে ভাবলাম এ টোকা আসাম সদিয়া অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না–মিসমিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে।

আপনার ভুল ধারণা।

আমি তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিসমিদের কাঠের কবচখানা বের করে তাঁর সামনে ধরে বললাম–দেখুন দিকি এ জিনিসটা কী? … চেনেন? যে-রাত্রে গাঙ্গুলিমশায় খুন হন, সে-রাত্রে তাঁর বাড়ির পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই। আসামে মিসমিজাতের মধ্যে এই ধরনের কাঠের কবচ পাওয়া যায় কিনা–তাই।

আমার খবরের সঙ্গেসঙ্গে জানকীবাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল–কিন্তু অত্যন্ত অল্পকালের জন্যে। পরমুহূর্তেই ভীষণ ক্রোধে তাঁর নাক ফুলে উঠল, চোখ বড়ো বড়ো

www.bengaliebook.com

হল। হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন বাঘের মতো এবং সঙ্গেসঙ্গে কবচ-সুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দু-হাতেই আমার গলা চেপে ধরলেন পাগলের মতো।

আমি এর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।

বরং জানকীবাবুই আমার যুযুৎসুর আড়াই-পেঁচির ছুটের জন্যে তৈরি ছিলেন না।

তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূর ছিটকে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি হেসে বললাম–এ লাইনে যখন নেমেচেন, তখন অন্তত দু-একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকীবাবু। কবচ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না। কবচ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন এটা আমার হাতে। এখন ভাগ্যদেবী আমায় দয়া করবেন।

কী বলছেন আপনি?

একথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায়। দাঁড়ান একটু এখানে।

থানার দারোগাবাবু কাছেই ছিলেন, আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসিমুখে বললেন–দয়া করে একটু এগিয়ে আসুন জানকীবাবু! খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। ...এই, লাগাও!

কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকীবাবুর হাতে হাতকড়ি লাগাল।

জানকীবাবু কী বলতে চাইলেন। দারোগাবাবু বললেন–আপনি এখন যা-কিছু বলবেন, আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে, বুঝেসুঝে কথা বলবেন।

জানকীবাবুর বিরুদ্ধে পুলিশ আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে। গাঙ্গুলিমশায় খুন হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন-অফিস ব্যাংকে সাড়ে ন-শো টাকা জমা রেখেছেন, পুলিশের থানা-তল্লাশিতে তার কাগজ বার হয়ে পড়ল।

তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার। জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম। তখন তাঁর প্রতি দন্ডাদেশ হয়ে গিয়েছে।

আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম–কেমন আছেন জানকীবাবু?

ধন্যবাদ! কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে হবে না আপনাকে।

একটু বেশি রাগ করেচেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমায় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে, তা বুঝতেই পারছেন।

থাক ওতেই হবে।

দেখুন জানকীবাবু, মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আপনি কতদূর হীন কাজ করেছেন। একজন অসহায়, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ–যিনি আপনাকে গাঁয়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মতো–এমনকী, আপনার শ্বশুরের মতো ব্যবহার করতেন, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাঁর টাকাকড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন –তাঁকে আপনি খুন করেছেন। পরকালে এর জবাবদিহি দিতে হবে যখন, তখন কী করবেন ভাবলেন না একবার?

মশায়, আপনাকে পাদ্রি-সাহেবের মতো লেকচার দিতে হবে না। আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান–আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেব–বিরক্ত করবেন না।

লোকটা সত্যিই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। নররক্তে হাত কলুষিত করেছে, অথচএখন মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্যন্ত জাগেনি ওর।

আমি বললাম–আপনি সংসারে একা, ছেলেপুলে নেই, স্ত্রী নেই। তাঁরা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তাঁরা দেখবেন না আপনি ভেবেচেন? তাঁদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে?

জানকীবাবু চুপ করে রইলেন এবার। আমি ভাবলুম, ওষুধ ধরেচে। আগের-কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম। জানি না আজ জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহপ্রীতি জাগ্রত আছে কিনা! কিন্তু আমার

www.bengaliebook.com

যতদূর সাধ্য তাঁর মনের সে দিকটাতে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম–বহুদিনের মরচেপড়া হৃদয়ের দোর যদি এতটুকু খোলে!

বললাম–ভেবে দেখুন জানকীবাবু, আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে গ্রাম, সেই গ্রামে বসে আপনি নরহত্যা করেছেন–এ যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন, তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে, মহাপুরুষেরা বলেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, মহাপুরুষদের বাণী তা বলে মিথ্যা হয়ে যাবে না।

জানকীবাবু আমার দিকে অদ্‌ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন–মশায়, আপনি কী কাজ করেন? এই কি আপনার পেশা?

খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধ হয়!

খারাপ আর কী!

দোষীকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবিধে করে দিই, যাতে তার পরকালে ভালো হয়।

আচ্ছা, এ আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন?

নিশ্চয়ই করি।

তবে শুনুন বলি, বসুন।

বেশ কথা, বলুন।

আমার দ্বারাই এ-কাজ হয়েছে।

অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি…

ও-কথা আর বলবেন না।

বেশ। কেন করলেন?

সে অনেক কথা। আমার উপায় ছিল না।

কেন?

আমি ব্যাবসা করতুম শুনেচেন তো? ব্যাবসা ফেল পড়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিকে দেনা। লোভ সামলাতে পারলাম না।

আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে। কিন্তু এটা লাগসই কৈফিয়ৎ হল না।

আমি তা জানি। দুর্বল মন আমাদের–কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বড়ো ইচ্ছে হয়।

স্বচ্ছন্দে বলুন।

আপনি ওই কবচখানা পেয়েছিলেন যেদিন, সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানা কী?

না।

কবে পারলেন?

আমার শিক্ষাগুরু মি. সোমের কাছে কবচের বিষয় সব জেনেছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলুন!

আপনি কেন আবার এ-গ্রামে এসেছিলেন, খুনের পরে?

আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেছেন।

আন্দাজ করেছি। কবচখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রেই–সেখানা খুঁজতে এসেছিলেন।

ঠিক তাই।

সেদিন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন, দিনমানে না খুঁজে?

দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম, রাত হয়ে পড়ল।

ওখানেই যে হারিয়েছিলেন, তা জানলেন কী করে?

ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি-ব্যাপার! কোনো জায়গায় যখন খুঁজে পেলাম না তখন মনে পড়ল, ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম, তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে। তাই–

আমি ওঁর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম। বললাম–সব কথা খুলে বলুন। আমি এখনও আপনার সব কথা শুনিনি! তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারছি।

জানকীবাবু ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁর গোপনীয় কথা শুনবার জন্যে জেলে সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। তাঁর এ ভাব পরিবর্তনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভয়ে দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

আমায় বললেন–ওখানা এখন কোথায়?

একজিবিট হিসেবে কোর্টেই জমা আছে।

তারপর কে নিয়ে নেবে?

আপনার সম্পত্তি, আপনার ওয়ারিশান কোর্টে দরখাস্ত করলে–

জানকীবাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দু-হাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন–না না আমি ও চাইনে, আমার ওয়ারিশান কেউ নেই, ও আমি চাইনে–ওই সর্বনেশে কবচই আমাকে আজ এ-অবস্থায় এনেচে। আপনি জানেন না ও কী!

এই পর্যন্ত বলে তিনি চুপ করে গেলেন। যেন অনেকখানি বেশি বলে ফেলেচেন– যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি। আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না।

আমি বললাম–আপনি যদি না নিতে চান, আমি কাছে রাখতে পারি।

আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বললেন–আপনি সাহস করেন?

এর মধ্যে সাহস করবার কী আছে? আমায় দেবেন।

আপনি আমায় পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমার শত্রু–তবুও এখন ভেবে দেখছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনি! আপনার ওপর

আমার রাগ নেই। আমি আপনাকে বন্ধুর মতো পরামর্শ দিচ্চিও-কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না।

কেন?

সে-অনেক কথা। সংক্ষেপে বললাম–ও-জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন।

আমি যেজন্যে আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। আমি এসেছিলাম আজ ওঁর মুখে কবচের ইতিহাস কিছু শুনব বলে। আমার ওভাবে কথা পাড়বার মূলে এই একটা উদ্দেশ্য ছিল। অনুনয়ের সুরে কোনো কথা বলে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম, সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম–আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন।

জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বললেন–কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি?

আপনার মতো ওইসব মন্ত্র-তন্ত্র-কবচে বিশ্বাস–ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয়, তবে কুসংস্কার আর কাকে বলব?

জানকীবাবু ক্রোধের সুরে বললেন–আপনি হয়তো ভালো ডিটেকটিভ হতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা বলে আপনি জানবেন?

আমি পূর্বের মতো তাচ্ছিল্যের সুরেই বললাম–আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন, তাঁর বাড়িতে ওরকম একখানা কবচ আছে।

কে তিনি?

মি. সোম, বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

যিনিই হোন, আমার তা জানবার দরকার নেই। একটা কথা আপনাকে বলি। যদি আপনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে অবিলম্বে তাঁকে বলবেন সেখানা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। কতদিন থেকে তাঁর সঙ্গে সেখানা আছে, জানেন।

তা জানিনে, তবে খুব অল্পদিনও নয়। দু-তিন বছর হবে।

আর আমার সঙ্গে এ-কবচ আছে সাত বছর। কিন্তু থাকগে।

বলেই জানকীবাবু চুপ করলেন। আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না, এমন ভাব দেখালেন।

আমি বললাম–বলুন, কী বলতে চাইছিলেন?

অন্য কিছু নয়, ও-কবচখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন– আর, এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না।

আমি তো বলেচি আমার কোনো কুসংস্কার নেই।

অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেছি, তাকে কুসংস্কার বলে মানতে রাজি নই। বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করব না। আপনি থাকুন কী উচ্ছন্নে যান, তাতে আমার কী?

এই যে খানিক আগে বলেছিলেন, আমার ওপর আপনার কোনো রাগ নেই?

ছিল না, কিন্তু আপনার নির্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে।

দেমাক দেখলেন কোথায়? আপনি তো কোনো কারণ দেখাননি। শুধুই বলে যাচ্ছেন– কবচ ফেলে দাও। আজকাল কোনো দেশে এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেচেন? একখানা কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে বলে আপনিও বিশ্বাস করেন?

আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে, যখন আর কোনো চারা নেই।

জিনিসটা কী, খুলে বলুন না দয়া করে!

শুনবেন তবে? ওই কবচই আমার এই সর্বনাশের কারণ। আমি বুঝেছিলাম এ-সম্বন্ধে জানকীবাবু কী একটা কথা আমার কাছে চেপে যাচ্ছেন। আগে একবার বলতে গিয়েও বলেননি, হঠাৎ গুম খেয়ে চুপ করে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছিলেন। এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন।

সুতরাং, আমি যেন তাঁর আসল কথার অর্থ বুঝতে পারিনি এমনভাব দেখিয়ে বললাম– তা বটে। একদিক থেকে দেখতে হলে, ওই কবচখানাই তো আপনার বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী।

জানকীবাবু আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন–আপনি কী বুঝেছেন, বলুন তো? কীভাবে দায়ী।

মানে, ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না–যদি ওখানা পকেট থেকে না পড়ে যেত?

কিছুই বোঝেননি।

এ-ছাড়া আর কী বোঝবার আছে?

আজ যে আমি একজন খুনি, তাও জানবেন ওই সর্বনেশে কবচের জন্যে। কবচ যদি আমার কাছে না থাকত তবে আজ আমি একজন মার্চেন্ট হতে পারে ব্যাবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম–কিন্তু ব্যাবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান কার না হয়? আমার বুকে সাহস ছিল, লোকসান আমি লাভে দাঁড় করাতে পারতাম। কিন্তু ওইকবচ তা আমায় করতে দেয়নি। ওই কবচ আমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট করেছে!

জানকীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। চুপ করে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জানকীবাবু বললেন–আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া অঞ্চলে ব্যাবসা করছি। পরশুরামপুর-তীর্থের নাম শুনেছেন?

খুব।

ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে। ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যাবসা শুরু করি। ওখানে দফলা, মিরি, মিসমি এইসব নামের পার্বত্য-জাতির বাস। একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে ঢুকেছি। জায়গাটার একদিকে ঝরনা, একদিকে উঁচু পাহাড়। তার গায়ে ঘন বাঁশবন। ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাঁশবন অত্যন্ত বেশি। কখনো গিয়েছেন ওদিকে?

আমি বললাম–না, তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাঁশবন দেখেচি, শিলং যাওয়ার পথে।

জানকীবাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরনেই বলি।

সেই পাহাড়ি-বাঁশবনে বন কাটবার জন্যে ঢুকে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় একটা বড়ো শালগাছের নীচে আমাদের দেশের বৃষ-কাষ্ঠের মতো লম্বা ধরনের কাঠের খোদাই এক বিকট-মূর্তি দেবতার বিগ্রহ।

কুলিরা বললে–বাবু, এ মিসমিদের অপদেবতার মূর্তি, ওদিকে যাবেন না।

জানকীবাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাঁর শখ হল মূর্তিটার ফোটো নেবেন। কুলিরা বারণ করলে, জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ক্যামেরা তেপায়ার উপর দাঁড় করিয়েছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিসমি এসে তাদের ভাষায় কী বললে। জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানত। সে বললে–বাবু, ফোটো নিও না, ও বারণ করছে।

অন্য অন্য কুলিরাও বললে–বাবু, এরা জবর জাত–সরকারকে পর্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তির ধনুক দিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কা রাখে না– ওদের দেবতার ফোটো খিচবার দরকার নেই।

জানকীবাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন–এতগুলি লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না। তারপর নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন, তখন আর-একবার সেই দেবমূর্তি দেখবার আগ্রহ হল।

সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই, পাহাড়ি-বাঁশবনের নিবিড় ছায়া-গহন পথে বন্য-জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়, বেণুবনশীর্ষে ক্ষীণ সূর্যালোক ও পার্বত্য-উপত্যকার নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েচে, কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন।

সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠল যখন সেখানে গিয়ে দেখলে, কোন সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেওয়া হয়েছে। শিশুটির ধড় ও মুন্ড পৃথক পৃথক পড়ে আছে, কাঠে-খোদাই বৃষকাষ্ঠ-জাতীয় দেবতার পাদমূলে! অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আধশুকনো রক্ত।

সেখানে সেদিন আর তাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না।...

জানকীবাবু বললেন–আমার কী কুগ্রহ মশায়, আর যদি সেখানে না যাই তবে সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু তা না করে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। কুলিদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল, সে বলেছিল, বাবু, তুমি কলকাতার লোক, এসব দেশের গতিক কিছু জান না। জংলি-দেবতা হলেও ওদের একটা শক্তি আছে– তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে, তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে–ওখানে অত যাতায়াত কোরো না বাবু। কিন্তু কারো কথা শুনলাম না, গেলাম শেষপর্যন্ত। লুকিয়েই গেলাম, পাছে কুলিরা টের পায়।

কেন যে জানকীবাবু সেখানে গেলেন, তিনি তা আজও ভালো জানেন না।

কিংবা হয়তো রক্তপিপাসু বর্বর দেবতার শক্তিই তাঁকে সেখানে যাবার প্ররোচনা দিয়েছিল… কে জানে!

জানকীবাবু বললেন–ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম, তাহলে তো বুঝতাম ফোটো নিতে যাচ্ছি–তাই বলেছিলাম, কেন যে সেখানে গেলাম, তা নিজেই ভালো জানি নে!

আমি বললাম–সে-মূর্তির ফোটো নিয়েছিলেন?

–না, কোনো দিনই না। কিন্তু তার চেয়ে খারাপ কাজ করেছিলাম, এখন তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠিক থমথম করচে দুপুর বেলা, পাহাড়ি পাখিদের ডাক থেমে গিয়েছে, বনতল নীরব, বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে শুকনো বাঁশের খোলা পাতা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

দেবমূর্তির একেবারে কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হল–কারণ, কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেননি।

গিয়ে দেখলেন, শিশুর শবের চিহ্নও সেখানে নেই। রাত্রে বন্যজন্তুতে খেয়েই ফেলুক, বা জংলিরাই নিজেরা খাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাক। অনেকক্ষণ তিনি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন– কেমন এক ধরনের মোহ, একটা সুতীব্র আকর্ষণ! সত্যিকার নরবলি দেওয়া হয় যে দেবতার কাছে, এমন দেবতা কখনো দেখেননি বলেই বোধ হয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হল, কিংবা অন্য কিছু তা বলতে পারেন না তিনি।

সেই সময় এই কাঠের কবচখানা দেবমূর্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকীবাবু কিছু না ভেবে –চারিদিকে কেউ কোথাও নেই দেখে– সেখানা চট করে মূর্তিটার গলা থেকে খুলে নিলে।…

আমি বিস্মিতসুরে বললাম–খুলে নিলেন! কী ভেবে নিলেন হঠাৎ?

ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাব এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচজনের কাছে দেখাব! নরবলি খায় যে দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসে গল্প করব তখন সঙ্গে সঙ্গে এখানা বার করে দেখাব। লোককে আশ্চর্য করে দেব, বোধ হয় এইরকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে। কিন্তু যখননিলাম গলা থেকে খুলে, তখনই মশায় আমার সর্বশরীর যেন কেঁপে উঠল। যেন মনে হল একটা কী অমঙ্গল ঘনিয়ে আসচে আমার জীবনে। ও-ধরনের দুর্বলতাকে কখনোই

আমল দিইনি– সেটা খুলে নিয়ে পকেটজাত করে ফেললাম একবারে। মিসমিদের অনেকে এ-রকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেছি কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ করে এ-কবচ তারা পরবেই।

তারপর?

তারপর আর কিছুই না। সাতবছর কবচ আছে আমার কাছে। জংলি-জাতের জংলি দেবতার কবচ, ও ধীরে ধীরে আমায় নামিয়েছে এই সাতবছরে। এক-একটা জিনিসের এক একটা শক্তি আছে। আমায় জাল করিয়েছে, পাওনাদারের টাকা মেরে দেবার ফন্দি দিয়েছে– শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্যন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যাবসাদার ছিলুম মশায়–আজ কোথায় এসে নেমেছি দেখুন! এ-প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা! আমি দেখেচি, যখনই ওখানা আমার কাছে থাকত, তখনই নানা রকম দুষ্টুবুদ্ধি জাগত মনে– কাকে মারি, কাকে ফাঁকি দিই। লোভ জিনিসটা দুর্দমনীয় হয়ে উঠত। গাঙ্গুলিমশায়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়িতে অন্ধকারে ইস্টিশানে নামি। কেউ আমায় দেখেনি। আমার পকেটে ওই কবচ–কিন্তু যাক সে-কথা, আর এখন বলব না।

বলুন না।

না। আমার ঘাড় থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েছে, আর সে-ছবি মনে করতে পারব না। এখন করলে ভয় হয়। নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়ল সে-রাত্রেই। আমার সর্বনাশ করে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হল বোধ হয়–কে বলবে বলুন! স্টিমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু। আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের ওপরস্টিমারে একজন বৃদ্ধ আসামি ভদ্রলোককে ওখানা দেখাই। তিনি আমায় বললেন, এ কোথায় পেলেন আপনি? এ মিরি আর মিসমিদের কবচ, পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েছে, ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেত–অপরকে খুন-জখম করতে যেত– তখন দেবতার মন্ত্রপূত এই কবচ পরত গলায়। এ-আপনি কাছে রাখবেন না, আপনাকে এ অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে। তখনও যদি তার কথা শুনি তাহলে কি আজ এমন হয়? তাই আপনাকে আমি বলছি, আমি তো গেলামই–ও-কবচ আপনি আপনার কাছে কখনো রাখবেন না।

জানকীবাবু চুপ করলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে। জানকীবাবুর মুখে কবচের ইতিহাসটা শুনবার জন্যেই আসা।

বললাম–আমি যা করেচি, কর্তব্যের খাতিরে করেছি। আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে। আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার!

বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওর কাছ থেকে।

* * * *

যতদূর জানি–এখন তিনি আন্দামানে।